Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতি

Subject Code | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |

Marks Distribution

☐ **ইনকোর্স পরীক্ষা ও উপস্থিতি : মান– ২০**

ক. ইনকোর্স পরীক্ষা — ১৫

খ. উপস্থিতি — ৫

☐ **সমাপনী পরীক্ষা : মান– ৮০**

ক. রচনামূলক প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ১৫ × ৪ = ৬০

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন : ৬টি প্রশ্ন থেকে যে-কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে– ৫ × ৪ = ২০

সর্বমোট = ১০০

Exclusive Suggestions

'ক' বিভাগ– রচনামূলক প্রশ্ন

মান– ১৫ × ৪ = ৬০

সম্ভাবনার হার	
৯৯%	১। ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর। [Define Islamic Economics. Discuss the characteristics of Islamic Economics.]
৯৯%	২। ইসলামি ভোক্তা কাকে বলে? একজন ইসলামি ভোক্তা ও সাধারণ ভোক্তার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর। [What do you mean by Islamic consumer? Distinguish between an Islamic consumer an conventional consumer.]
৯৯%	৩। চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার পার্থক্য নির্ণয় কর। একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর। [Distinguish between demand schedule and demand curve. Draw a demand curve from an imaginary demand schedule.]
৯৯%	৪। ইসলামি ব্যাংক ও গতানুগতিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংক্ষেপে ইসলামি ব্যাংক উদ্ভাবনের ক্রম-ইতিহাস বর্ণনা কর। [Make a distinction between Islamic bank and conventional bank. Briefly discuss the history of foundation of Islamic bank.]
৯৯%	৫। মূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলামি সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর। [Describe the role of an Islamic Government in controlling price.]
৯৯%	৬। পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে কী বুঝ? ইসলামে কেন পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজার পছন্দ করা করা হয়? আলোচনা কর। [What do you mean by the perfect competitive market? Why does Islam prefer perfect competitive market? Discuss.]
৯৯%	৭। ইসলামি বিমা কী? ইসলামি বিমার গুরুত্ব আলোচনা কর। [What is Islamic Insurance? Describe the importance of Islamic Insurance.]
৯৯%	৮। মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বর্ণনা কর। [What is inflation? Describe the effects of inflation.]
৯৯%	৯। ভোগ বলতে কী বুঝ? ভোগ সম্পর্কে ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর। [What do you mean by consumption? Discuss the views of Islamic Economics regarding consumption.]
৯৯%	১০। হালাল-হারাম বলতে কী বুঝ? মানব জীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের অপকারিতা আলোচনা কর। [What do you mean by Halal and Haram? Discuss the importance of earnings in Halalway and demerits of earnings in Haramway in human life.]
৯৯%	১১। ইসলামি ব্যাংক কী? ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর। [What is Islamic Bank? Discuss the functions of Islamic Bank.]

‘খ’ বিভাগ– সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

মান– ৫ × ৪ = ২০

সম্ভাবনার হার	
৯৯%	১২। ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের মূলনীতিগুলো লেখ। [Write the principles of distribution of wealth in Islamic economics.]
৯৯%	১৩। ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর। [Explain the law of diminishing marginal utility.]
৯৯%	১৪। অর্থের কার্যাবলি আলোচনা কর। [Discuss the function of money.]
৯৯%	১৫। যাকাতের ব্যয়ের খাতসমূহ আলোচনা কর। [Discuss the Masaref of Zakat.]
৯৯%	১৬। মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [Make distinction between profit and interest.]
৯৯%	১৭। ইসলামি ব্যাংকের কাজসমূহ লেখ। [Write the mode of operations of an Islamic Bank.]
৯৯%	১৮। মুশারাকা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। [Explain the concept of 'Musharakah'.]
৯৯%	১৯। ইসলামে শ্রমনীতির ব্যাখ্যা কর। [Explain the labour policy in Islam.]
৯৯%	২০। ইসলামি বিমার গুরুত্ব বর্ণনা কর। [Describe the importance of Islamic Insurance.]
৯৯%	২১। যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর। [Discuss the importance of Zakat.]
৯৯%	২২। শ্রম বিভাগ কী? [What is division of Labour?]

Al-Fatah Exclusive Exam Aid

FAZIL (Hon's) First Year Exam-2024

আল-কুরআন অ্যান্ড ইসলামিক স্টাডিজ

অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতি

Solution to Exclusive Suggestions

ক বিভাগ– রচনামূলক প্রশ্ন

মান– ১৫ × ৪ = ৬০

■ প্রশ্ন : ১ ॥ ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা দাও। ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা কর।

[Define Islamic Economics. Discuss the characteristics of Islamic Economics.]

উত্তর।। **ভূমিকা :** অর্থনীতির আরবি প্রতিশব্দ আন-নিয়ামুল ইকতিসাদ। এটির উৎপত্তি 'কসদুন' (قَصْدٌ) মূল ধাতু থেকে। এর অর্থ হলো– রুচিসম্মত চাল-চলন, মধ্যমপন্থা। যেহেতু ইসলামি অর্থনীতি মধ্যম পন্থায় অর্থনৈতিক জীবনযাপনের পদ্ধতি ও পন্থা নির্দেশ করে, এজন্য একে আন-নিয়ামুল ইকতিসাদ বলা হয়। একটি গতিশীল বিষয় হিসেবে ইসলামি অর্থনীতি ইসলামি জীবন দর্শন, কৃষ্টি ও সভ্যতার সাথে একই সূত্রে গাঁথা। তাই ইসলামি অর্থনীতি মানুষের সামগ্রিক জীবনব্যবস্থার সাথে সর্বতোভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ অর্থনীতি চিরন্তন মূল্যবোধের সমন্বয়ে একটি বিশ্বজনীন পদ্ধতি, যা সম্পদের সুষম বণ্টন, সামাজিক ন্যায়বিচার ও সমতা নিশ্চিত করে।

১ ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা

প্রচলিত অর্থব্যবস্থার সংজ্ঞা নিরূপণ করা খানিকটা সহজ হলেও ইসলামি অর্থনীতির বিশ্লেষণ বেশ জটিল। ইসলামি অর্থনীতিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় এভাবে, "মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নীতি-পদ্ধতি অনুসরণে সৃষ্টির লালন-পালনের যাবতীয় পার্থিব সম্পদের সামগ্রিক কল্যাণধর্মী ব্যবস্থাপনাই ইসলামি অর্থনীতি।"

অন্যভাবে বলা যায়, "যে সমাজবিজ্ঞান ইসলামি ভাবধারায় অনুপ্রাণিত জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক সমস্যা পর্যালোচনা করে, তা-ই ইসলামি অর্থনীতি।"

২ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

ইসলামি অর্থনীতি সম্পর্কে দার্শনিকগণের অভিমত তুলে ধরা হলো–

১. অর্থনীতিবিদ **ড. এম নেজাতুল্লাহ সিদ্দিকীর** মতামত হলো "Islamic economics is the muslim thinkers' response to the economic challenges of their times." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি সমকালীন অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় মুসলিম চিন্তাবিদদের জবাব।

২. অর্থনীতিবিদ **ড. এম. এ. মান্নান** বলেন, "Islamic economics is a social science which studies the economic problems of the people in the light of Quran and Sunnah." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি হলো একটি সামাজিক বিজ্ঞান, যা কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে মানুষের অর্থনৈতিক সমস্যাবলি নিয়ে আলোচনা করে।

৩. ইসলামি অর্থনীতিবিদ **Dr. Khorshed Ahmed** বলেন, "Islamic economics represents a systematic effort to try to understand the economic problem and man's behaviour in relation to that problem from an Islamic perspective." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি হলো ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনীতির সমস্যা ও ঐসব সমস্যার সমাধানে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতে মানবীয় আচরণকে বোঝার এক পদ্ধতিগত প্রয়াস।

৪. প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের **প্রফেসর ড. এম. এ. হামিদ** ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞায় বলেন, "ইসলামি অর্থনীতি হলো, ইসলামি বিধানের সেই অংশ, যা প্রক্রিয়া হিসেবে দ্রব্য ও সেবাসামগ্রী উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের প্রসঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও নৈতিক আচরণকে সমন্বিতভাবে অধ্যয়ন করে।"

৫. ফার্সী ভাষায় লিখিত **'আখলাকে নাসিরী'** গ্রন্থের লেখক **মুহাম্মদ বিন হাসান তুসী** (১২০১-১২৭৪) বলেন, "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃত্তি ও জনকল্যাণের বিজ্ঞান।"

৬. **ইবনে খালদুন**-এর মতে, "ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে জনগণের কল্যাণের সাথে সম্পর্কিত বিজ্ঞান।"

৭. প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **ড. মনজের কাহাফের** মতে, "An Islamic Economy is defined as an economy where the Islamic laws and institutions prevail; and where the majority of its individuals believe in the Islamic ideology and practice its way of life." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি বলতে এখন অর্থনীতিকেই বোঝায়, যেখানে ইসলামি আইন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্তিত্বশীল থাকে এবং যেখানে অধিকাংশ মানুষ ইসলামি আদর্শে বিশ্বাস করে এবং সে অনুযায়ী নিজেদের পরিচালনা করে।"

৮. রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক ও ইসলামি অর্থনীতির খ্যাতিমান গবেষক **প্রফেসর শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমানের** মতে, "ইসলামি অর্থনীতি বলতে ঐ অর্থনীতিকেই বুঝায় যার আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য, কর্মপদ্ধতি এবং পরিণাম ফল ইসলামি আকিদা মুতাবিকই নির্ধারিত হয়।"

৯. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং প্রখ্যাত ইসলামি অর্থনীতিবিদ **অধ্যাপক রায়হান শরীফের** মতে, "ইসলামি অর্থনীতি বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে বুঝায়, যার রীতিনীতি, বিধি, তত্ত্ব, তথ্য, সমস্যা ও সমাধানকে ইসলামি সমাজ ও জীবন দর্শনের কাঠামোর অন্তর্গত হিসেবে ধরে নেয়া হয়।"

১০. **প্রিন্স মুহাম্মদ আল-ফয়সাল আল সউদের মতে,** "Islamic Economics is the science of how man uses resources and means of production to study his worldly needs according to a predetermined Allah given code in order to achieve the greatest equity." অর্থাৎ, ইসলামি অর্থনীতি হলো এমন একটি বিজ্ঞান, যা আল্লাহ প্রদত্ত নীতিমালার আওতায় সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণসমূহের ব্যবহার এবং মানুষের পার্থিব চাহিদা মিটানোর ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিকনির্দেশনা প্রদান করে।

➲ ইসলামি অর্থনীতির বৈশিষ্ট্য

বর্তমান বিশ্বে দু'টি অর্থব্যবস্থা প্রচলিত আছে। একটি পুঁজিবাদ ও অপরটি সমাজতন্ত্র। এদুটি অর্থব্যবস্থা মানুষের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছে। বিশ্বমানব আজ এই উভয় প্রকার সমাজ ও অর্থব্যবস্থা হতে পরিপূর্ণভাবে মুক্তি পেতে চায়। একমাত্র ইসলামি অর্থব্যবস্থাই মানুষের এই আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে পারে। তাদেরকে সঠিক কল্যাণের ও মুক্তির পথ দেখাতে সক্ষম। ইসলামি অর্থনীতির মধ্যেই এই প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। ইসলামি অর্থনীতির প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ–

১. **শরীয়তসম্মত পন্থায় উপার্জন :** জীবন জীবিকার সর্বক্ষেত্রে ইসলাম কাউকে লাগামহীন স্বাধীনতা দেয়নি। জীবিকা অন্বেষণকালে সব সময় দুটি নীতি অনুসরণ করতে বলা হয়েছে–
   ১. জীবিকা হালাল হওয়া।
   ২. পবিত্র পথে উপার্জন করা।

২. **ইসলামি শরীয়াভিত্তিক :** ইসলামি অর্থব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামি শরীয়ার নীতিমালা অনুসরণ করে। এর মূল উৎস হলো কুরআন মাজিদ ও হাদীস শরীফ। কুরআন-হাদিসে প্রদত্ত নীতিমালার আলোকে কেয়াসের মাধ্যমে এটি পরিচালিত হয়। ইজমার মাধ্যমে এ অর্থব্যবস্থার বিধানসমূহ সুদৃঢ় হয়েছে। এভাবে কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কেয়াসের মাধ্যমে উৎসারিত অর্থব্যবস্থা হলো ইসলামি অর্থব্যবস্থা। এজন্য ইসলামি অর্থব্যবস্থা মূলত ইসলামি শরীয়াভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা।

৩. **উৎপাদন ও উপার্জন নীতি :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় যা খুশি উৎপাদন করা যায় না, যেভাবে খুশি উপার্জনও করা যায় না। জনস্বাস্থ্য ও স্বার্থের জন্য হুমকি এমন সব উৎপাদন ইসলামে নিষিদ্ধ। এ ব্যবস্থায় আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন এমন কোনো কিছুর উৎপাদন বৈধ নয়। উপার্জনের ক্ষেত্রেও হালাল উপার্জন বাধ্যতামূলক। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– كَسْبُ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ
অর্থ : "হালাল উপার্জন করা ফরযের চেয়েও ফরয।" একারণে লাভজনক হলেও ইসলামি অর্থব্যবস্থায় মাদক দ্রব্য উৎপাদন ও বিপননের সুযোগ নেই। সুদ, ঘুষ, চুরি বা সম্পদ আত্মসাতের মাধ্যমেও ইসলামি অর্থ ব্যবস্থায় উপার্জন নিষিদ্ধ।

৪. **ব্যয়নীতি :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় ইচ্ছেমতো যে-কোনো খাতে অর্থ ব্যয়ের সুযোগ নেই। কেবল হালাল পথে ব্যয় করা যাবে। হারাম বস্তু কেনা বা হারাম কাজ সম্পাদনে সম্পদ ব্যয়ের অনুমতি নেই। ব্যক্তি প্রয়োজন অনুসারে সম্পদ ব্যয় করবে। অপব্যয় বা অপচয় করা ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন, كُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ ـ
"তোমরা খাও এবং পান কর কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয় আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালোবাসেন না।" (সূরা আরাফ : ৩১)
ইসলামি অর্থব্যবস্থায় অপচয়-অপব্যয়ের যেমন সুযোগ নেই, তেমনি এ ব্যবস্থায় কৃপণতারও অবকাশ নেই।
আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ إِذَا اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا
"আর যখন তারা ব্যয় করে, তখন অপব্যয় করে না। কার্পণ্যও করে না।" বরং তারা এ দুয়ের মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করে। (সূরা ফুরকান : ৬৭)
নিজস্ব প্রয়োজন পূরণের পর অর্থ অতিরিক্ত থাকলে তা অভাবী ও নিঃস্ব লোকদের কল্যাণে ব্যয় করবে। রাসূল (স) বলেন– "হে আদম সন্তান! তোমার জন্য তা হবে কল্যাণকর, যদি তুমি তোমার অতিরিক্ত অর্থ অভাবীদের অভাব মোচন ও দ্বীনের কাজে খরচ কর।" (সুনানে তিরমিযি)

৫. **সুদমুক্ত :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সব লেনদেন সংঘটিত হবে সুদমুক্ত। এ ব্যবস্থায় কোনো ক্ষেত্রেই সুদভিত্তিক লেনদেন হালাল রাখা হয়নি। সুদ নিষিদ্ধ করে শোষণের পথ বন্ধ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا
"আর আল্লাহ ব্যবসায় হালাল করেছেন এবং সুদ হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা : ২৭৫)
শোষণমুক্ত সমাজ বিনির্মাণে ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সুদের প্রচলন নেই। রাসূল (স) সুদসংশ্লিষ্ট সবার জন্য আল্লাহর অভিশম্পাত কামনা করেছেন।

৬. **সঞ্চয়নীতি :** প্রয়োজনীয় অর্থ সঞ্চয়ে ইসলামে নিষেধাজ্ঞা নেই। কিন্তু বিত্ত-বৈভব ও ঐশ্বর্যের পাহাড় গড়ে তোলা কিংবা নিকটাত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অভাব অনটনে সাহায্য না করে সম্পদ সঞ্চয় করা ইসলাম সমর্থন করে না। বরং নিঃস্ব ও দুঃস্থদের প্রয়োজনে সঞ্চিত সম্পদ দান না করার ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন–

اَلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ ـ

"যারা সোনা ও রূপা সঞ্চয় করে রাখে কিন্তু তা থেকে আল্লাহর পথে ব্যয় করে না তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিন।" (সূরা তাওবা : ৩৪)

৭. **সম্পদের মালিকানা :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সম্পদের প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ তায়ালার। মানুষ প্রকৃত মালিক নয়। বরং আল্লাহর পক্ষে নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়ক ও সংরক্ষক। ইসলামি অর্থনীতিতে মানুষকে সম্পদ ব্যবহারের যে অধিকার প্রদান করা হয়েছে, সীমিতার্থে তাকেও মালিকানা বলা হয়। সে হিসেবে এ অর্থব্যবস্থায় ব্যক্তিমালিকানা স্বীকৃত। তবে তা পুঁজিবাদের মতো অবাধ এবং স্বেচ্ছাচারী নয়। আবার সমাজবাদের মতো সামষ্টিক বা রাষ্ট্রীয় মালিকানাও নয়। বরং এ হলো আল্লাহ তায়ালার বিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুনির্দিষ্ট ব্যক্তিমালিকানা।

৮. **বণ্টন নীতি :** ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের সুষম ও ভারসাম্যপূর্ণ বণ্টননীতি অনুসৃত হয়। এখানে কেউ সম্পদের পাহাড় গড়ে তুলতে পারে না আবার কারো পক্ষে নিঃস্ব থাকারও সুযোগ নেই। এ ব্যবস্থায় ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার সুনির্ধারিত। আল্লাহ তায়ালা বলেন, وَفِيْ اَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ

"আর তাদের (ধনীদের) সম্পদে যাচঞাকারী ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে।" (সূরা জারিয়াত : ১৯)

৯. **যাকাতভিত্তিক :** ইসলামি অর্থনীতি যাকাতভিত্তিক পরিচালিত হয়। কোনো মুসলিম ব্যক্তির কাছে তার প্রয়োজনীয় ব্যয়ের পর সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রূপা কিংবা এর সমপরিমাণ অর্থ পূর্ণ এক বছর অতিরিক্ত থাকলে বছর শেষে তাকে ২.৫% হারে যাকাত আদায় করতে হয়। যাকাতলব্ধ অর্থ কিছু সুনির্দিষ্ট খাতে কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত হয়। এর ফলে সমাজের নিঃস্ব ও অভাবী মানুষ দারিদ্র্যমুক্ত হয়। সমাজ অভাব মুক্ত হয়, মানুষের মধ্যে বিত্ত ও ঐশ্বর্যের ব্যবধান কমে আসে। ইসলামি অর্থব্যবস্থার পুরো আর্থিক অবকাঠামো যাকাতের ভিত্তিতে আবর্তিত হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন, (اَلْبَقَرَة : ৪৩ + ১১০) اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ

১০. **বায়তুলমাল ব্যবস্থা :** ইসলামি অর্থনীতি বায়তুলমালভিত্তিক। এ ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় অর্থপ্রশাসন হলো বায়তুলমাল। রাষ্ট্রের সব আয় বায়তুলমালে জমা হয়। লোকেরা দীনি দায়িত্বানুভূতি নিয়ে যাকাতসহ সব অনিবার্য ও ঐচ্ছিক দান বায়তুলমালে প্রদান করে। এ অর্থব্যবস্থায় বায়তুলমাল কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায়িত্ব পালন করে থাকে।

১১. **হালাল-হারাম নির্ধারণ :** ইসলামি অর্থব্যবস্থায় সব রকমের অর্থ-সম্পদের হালাল-হারাম সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। সে জন্য ইসলামি আদর্শের অনুসারী লোকদের অর্থ উপার্জন ও আয়ে যেমন হালাল-হারাম মেনে চলতে হয়, তেমনি সম্পদ ব্যয় ও ভোগের ক্ষেত্রেও হালাল-হারামের সীমা-পরিসীমা মেনে চলতে হয়। আল্লাহ তায়ালা বলেন– وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتُ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

"আর আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র বিষয়সমূহ হালাল করেছেন এবং তাদের ওপর অপবিত্র বস্তুসমূহ ব্যবহার হারাম করেছেন।" (সূরা আরাফ : ১৫৭)

১২. **স্বার্থসংরক্ষণ :** ইসলামি অর্থনীতি ধনী, গরিব, নির্যাতিত, বঞ্চিত ও শোষিতদের স্বার্থরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অন্যায়ভাবে কারো অর্থসম্পদ ভোগ দখলের সুযোগ নেই। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَاٰتُوا الْيَتٰمٰى اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْثَ بِالطَّيِّبِ ـ وَلَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَهُمْ اِلٰى اَمْوَالِكُمْ ـ اِنَّهٗ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا ـ

"আর তোমরা ইয়াতিমদেরকে তাদের ধন-সম্পদ সমর্পণ করবে এবং পবিত্র সম্পদের সাথে অপবিত্র সম্পদ বদলাবে না। তোমাদের সম্পদের সাথে মিলিয়ে তাদের সম্পদ আত্মসাত করবে না। এটা মহাপাপ।" (সূরা নিসা : ২)

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– "যে ব্যক্তি অন্যের এক টুকরো জমি জোর করে দখল করে নিয়েছে, কেয়ামতের দিন তার গলায় সাত স্তর জমি বেড়ি করে পরিয়ে দেওয়া হবে।" (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

১৩. **অর্থনৈতিক সদাচার ও সুবিচার :** ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থ সম্পর্কিত কার্যক্রমের সাথে ন্যায়নিষ্ঠা ও সুবিচার এবং ইহসান বা সদাচার নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। নিজের হক বুঝে নেওয়া ও অন্যের হক আদায় করে দেওয়ার ব্যাপারে এ ব্যবস্থায় বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– اَعْطُوا الْاَجِيْرَ اَجْرَهٗ قَبْلَ اَنْ يَجِفَّ عَرَقُهٗ

"ঘাম শুকোবার আগে শ্রমিকের পাওনা মিটিয়ে দাও।" (সুনানে নাসায়ি)

১৪. **মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা :** ইসলামি অর্থনীতিতে সমাজের সব পর্যায়ের মানুষের মৌল মানবিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। এ ব্যবস্থায় এমনভাবে অর্থ উপার্জন ও ব্যয়ের নীতি নির্ধারণ করা হয়েছে, যাতে সমাজের কোনো পর্যায়ের মানুষকেই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বিনোদন নিয়ে চিন্তিত হতে না হয়।

১৫. **আর্থিক দুর্নীতি উচ্ছেদ :** ইসলামি অর্থনীতিতে অর্থসংশ্লিষ্ট সব দুর্নীতি ও অনাচার হারাম করা হয়েছে। পৃথিবীতে শাস্তির বিধান দিয়ে এবং পরকালে চিরস্থায়ী শাস্তির ভয় দেখিয়ে এ ব্যবস্থায় সব অর্থনৈতিক অপরাধ নির্মূলের ব্যবস্থা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا يُرِيْدُ بِهِ الْغَلَاءَ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللّٰهِ وَبَرِئَ اللّٰهُ مِنْهُ.

"দাম বাড়ার আশায় যে লোক খাদ্যসামগ্রী চল্লিশ দিন ধরে মজুদ রাখে, তার সাথে আল্লাহর এবং আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়।"

রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– اَلرَّاشِىُ وَالْمُرْتَشِىُ فِى النَّارِ

"ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা জাহান্নামে থাকবে।"

আল্লাহ তায়ালা বলেন– "পুরুষ চোর বা নারী চোর তাদের উভয়ের দু'হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের ফল এবং আল্লাহর নির্ধারিত দন্ড।"

১৬. আখিরাতভিত্তিক : ইসলামি অর্থনীতি আখিরাতভিত্তিক। এ ব্যবস্থায় মানুষের পৃথিবীর সুখ-সমৃদ্ধি নিশ্চিত করার পাশাপাশি আখিরাতের সুখ নিশ্চিত করার ব্যবস্থাও রয়েছে। এ লক্ষ্যে আখিরাতের জীবনের জন্য হুমকি হতে পারে বা আখিরাতে আল্লাহর শাস্তির কারণ হতে পারে, এমন সব বিষয়ের অর্জন ও ভোগ-ব্যবহার নিষিদ্ধ।

উপসংহার : উল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামি অর্থনীতি তার জীবন দর্শন হতে বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ কোনো বিষয় নয়। এটি জীবনঘনিষ্ঠ ব্যবস্থা। এটি মূলত ইসলামের বিরাট, ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থারই একটি অপরিহার্য অংশ মাত্র।

■ প্রশ্ন : ২ ॥ ইসলামি ভোক্তা কাকে বলে? একজন ইসলামি ভোক্তা ও সাধারণ ভোক্তার মধ্যে পার্থক্য আলোচনা কর।

[What do you mean by Islamic consumer? Distinguish between an Islamic consumer an conventional consumer.]

উত্তর ।। ভূমিকা : ইসলামি অর্থনীতিতে ভোক্তার ইসলামি আচরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়। ইসলামি ভোক্তা ধারণাটি শুধু ইসলামি অর্থনীতির সাথে সম্পৃক্ত। যে সকল ভোক্তার ভোগ আচরণ পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক নীতিমালা দ্বারা পরিচালিত, তাদেরকে 'পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ভোক্তা' বলা হয়। পুঁজিবাদের মূল দর্শন হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজ স্বার্থ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা সচেতন। অর্থাৎ উৎপাদনকারী হিসেবে মানুষ যেমন তার আপন মুনাফা অনুযায়ী চলে, তেমনি ভোগকারী হিসেবেও সে তার ভালোমন্দ সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন থাকে। পুঁজিবাদী ভোক্তার সাথে একজন ইসলামি ভোক্তার আচরণের পার্থক্য রয়েছে। মন ও আত্মার চাহিদাকে সমন্বিত করার ভূমিকাই আসে এমনি শৃঙ্খলাবোধ থেকে।

➲ ইসলামি ভোক্তার সংজ্ঞা

সাম্প্রতিককালে ইসলামি অর্থনীতিবিদগণ 'ইসলামি ভোক্তা' নামে একটি নতুন ধারণার প্রবর্তন করেছেন। যেসব ভোক্তা ইসলামি শরীয়তের সীমারেখার ভেতরে থেকে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্ম ভোগ করে তাদেরকে ইসলামি ভোক্তা বলে। একজন ইসলামি ভোক্তা হারাম-হালাল যাচাই করে ভোগ করে এবং হারাম দ্রব্যের ভোগ থেকে বিরত থাকে। ইসলামি ভোক্তা সম্পদের অপব্যয় বা অপচয় করে না; আবার কার্পণ্যও করে না। সে সর্বদা মধ্যম পন্থা অবলম্বন করে। আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি লাভের জন্য সে নিজের ভোগকে কমিয়ে দুঃখী, নিঃস্ব ও অভাবী লোকদের ভোগে সহায়তা করে। তাই ইসলামি ভোক্তাগণ ইহকালীন ভোগের পাশাপাশি পরকালীন ভোগকেও গুরুত্ব দেয়। তারা অবশ্যই ভোগের নিম্নলিখিত পাঁচটি মূলনীতি মেনে ভোগ করবে; যথা– (১) পবিত্রতা (২) আত্মসংযম (৩) ন্যায়পরায়ণতা (৪) উপকারিতা ও (৫) নৈতিকতা।

➲ ইসলামি ভোক্তা ও সাধারণ ভোক্তার মধ্যে পার্থক্য

ইসলামি ভোক্তা ও সাধারণ ভোক্তার মধ্যে পার্থক্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ইসলামি ভোক্তা	সাধারণ ভোক্তা
১. ইসলামি ভোক্তার ভোগতৃপ্তির উৎস হলো পার্থিব ভোগ ও পারলৌকিক ভোগ (অর্থাৎ হতদরিদ্র, গরিব, মিসকিন ও অসহায়ের সহযোগিতা)।	পার্থিব ভোগই সাধারণ ভোক্তার ভোগতৃপ্তির একমাত্র উৎস।
২. একজন ইসলামি ভোক্তার আচরণ ইসলামি যুক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত, যা ইসলামি আদর্শ দ্বারা নির্দেশিত।	একজন সাধারণ ভোক্তার আচরণ অর্থনৈতিক যুক্তিবাদ দ্বারা পরিচালিত, যা তার নিজ স্বার্থ দ্বারা প্রভাবান্বিত।
৩. ইসলামি ভোক্তা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য মেনে চলে এবং হারাম দ্রব্যের ভোগ থেকে নিজেকে বিরত রাখে।	সাধারণ ভোক্তা হালাল ও হারামের মধ্যে কোনো পার্থক্য করে না, যদি তা করেও, তবে তা সচেতনভাবে নয়।
৪. পার্থিব ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামি ভোক্তা ন্যূনতম তিন ধরনের পছন্দ সমস্যার সম্মুখীন হন। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ ভোগের মধ্যে, প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে যেমন– আবশ্যকীয় ও বিলাসজাত এবং সর্বোপরি নিজ বা নিজ পরিবার ও গরিব-মিসকিনদের মধ্যে।	একজন সাধারণ ভোক্তা তার ভোগ-পছন্দ শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যতের মধ্যে এবং বড়জোর বিভিন্ন শ্রেণির প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখে।
৫. ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ ব্যবহার না করে অহেতুক ফেলে রাখা ও নষ্ট করা বৈধ নয়।	সাধারণ অর্থনীতিতে এ ধরনের কোনো বিধিনিষেধ নেই।

ইসলামি ভোক্তা	সাধারণ ভোক্তা
৬. সঞ্চয়ে উৎসাহী হওয়া এবং সঞ্চিত অর্থ উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ করাও ইসলামি ভোক্তার নৈতিক দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।	একজন সাধারণ অর্থনৈতিক ভোক্তার ক্ষেত্রে এ ধরনের নৈতিকতা প্রযোজ্য নয়।
৭. একজন ইসলামি ভোক্তার নৈতিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হলো ব্যয়ের ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা অবলম্বন করা।	এমন মতাদর্শগত বিধি নিষেধ সাধারণ ভোক্তার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত।
৮. সামর্থ্য ও প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও হালাল দ্রব্য ও সেবার ভোগ থেকে বিরত থাকা অথবা সমাজ-সংসার বিমুখ হয়ে বৈরাগ্যবাদ বরণ করে নেওয়া তার জন্য নিষিদ্ধ।	এমন কোনো বিধিবিধান সাধারণ অর্থনৈতিক ভোক্তার ক্ষেত্রে নেই যে, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও দ্রব্য বা সেবার ভোগ থেকে বিরত থাকতে হবে।
৯. ইসলামি মূল্যবোধের মধ্যে ভোক্তার সার্বভৌমত্বের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। তাকে হারামসামগ্রী ভোগের অনুমতি দেওয়া হয়নি এবং প্রতিবেশীকে অভুক্ত রেখে নিজেকে পেট পুরে খেতে নিষেধ করা হয়েছে।	একজন সাধারণ ভোক্তা কোনো দ্রব্য বা সেবা ভোগ করবে তা পছন্দ করার পূর্ণ স্বাধীনতা পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে রয়েছে। ঐসব দ্রব্য পছন্দ করার ক্ষেত্রে তার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা রয়েছে, যা তাকে সর্বোচ্চ তৃপ্তি প্রদান করবে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি ভোক্তা এবং সাধারণ ভোক্তার মধ্যে যেসব পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা হলো পুঁজিবাদী ভোক্তার ভোগের ক্ষেত্রে কোনো মৌলিক নীতিমালা নেই। কোনো প্রকার বিচার-বিবেচনা ছাড়াই সে যা ইচ্ছা তা ভোগ করতে পারে; কিন্তু ইসলামি ভোক্তার ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধিবিধান, নৈতিকতা, মানবতা এসব বিষয় প্রাধান্য পায়।

■ প্রশ্ন : ৩ ॥ চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার পার্থক্য নির্ণয় কর। একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন কর।
[Distinguish between demand schedule and demand curve. Draw a demand curve from an imaginary demand schedule.]

উত্তর ।। ভূমিকা : চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। উভয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একই। দ্রব্যের দাম ও চাহিদার মধ্যে যে বিপরীতমুখী সম্পর্ক রয়েছে তা চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়; কিন্তু তা সত্ত্বেও চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে বেশ কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য রয়েছে। চাহিদা বিধি অনুযায়ী অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থেকে কোনো দ্রব্যের দাম কমলে তার চাহিদার পরিমাণ বাড়ে এবং দ্রব্যের দাম বাড়লে তার চাহিদা কমে। দাম ও চাহিদার পরিমাণের এ বিপরীত সম্পর্ক সাধারণত চাহিদা অপেক্ষক, চাহিদা সূচি এবং চাহিদা রেখার মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

➲ চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে পার্থক্য

চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখা উভয়ই চাহিদা বিধিকে প্রকাশ করে। তবে তাদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নেই। শুধু পদ্ধতিগতভাবে এরা পৃথক। উভয়ের মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্যসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

১. **সংজ্ঞাগত পার্থক্য :** কোনো নির্দিষ্ট সময়ের ক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করে তা যখন তালিকার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে 'চাহিদা সূচি' বলে। পক্ষান্তরে একই তথ্য যখন রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে 'চাহিদা রেখা' বলা হয়।

২. **প্রকাশগত পার্থক্য :** চাহিদা সূচি হলো চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশ। চাহিদা সূচিতে বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ গাণিতিক সংখ্যায় প্রকাশ করা হয়। পক্ষান্তরে, চাহিদা রেখা হলো চাহিদা বিধির জ্যামিতিক প্রকাশ। চাহিদা রেখায় বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ জ্যামিতিক পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়।

৩. **ভিত্তিগত পার্থক্য :** ভোক্তা বা ক্রেতার আচরণের উপর ভিত্তি করে চাহিদা সূচি তৈরি করা হয়। পক্ষান্তরে, চাহিদা সূচির উপর ভিত্তি করে চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হয়।

৪. **নির্ভরশীলতার পার্থক্য :** চাহিদা সূচি নির্ভর করে চাহিদা সমীকরণের উপর। পক্ষান্তরে, চাহিদা রেখা নির্ভর করে চাহিদা সূচির উপর।

৫. **উপস্থাপনগত পার্থক্য :** চাহিদা সূচিতে সাধারণত ছকের বামদিকে দ্রব্যের দাম এবং ডানদিকে দ্রব্যের চাহিদার পরিমাণ উপস্থাপন করা হয়। পক্ষান্তরে, চাহিদার রেখায় OX অক্ষে বা ভূমি অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে বা লম্ব অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হয়।

চাহিদা সূচি

দাম (P) (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (Q) (একক)
5	30
10	20
15	10

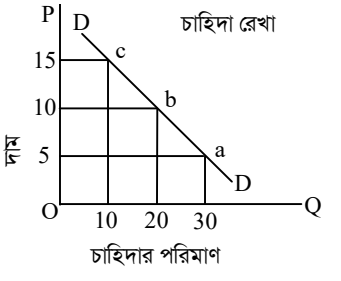

➲ একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি থেকে চাহিদা রেখা অঙ্কন

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ক্রেতা বিভিন্ন দামে একটি দ্রব্যের যে বিভিন্ন পরিমাণ ক্রয় করতে প্রস্তুত থাকে, তার তালিকাকে 'চাহিদা সূচি' বলে। এ চাহিদা সূচিই হলো চাহিদা রেখার ভিত্তি। যে-কোনো একটি নির্দিষ্ট চাহিদা সূচির ভিত্তিতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়। নিম্নে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি দেওয়া হলো এবং এ চাহিদা সূচির ভিত্তিতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :

কাল্পনিক চাহিদা সূচি

চালের দাম (টাকা)	চাহিদার পরিমাণ (কেজি)
১০	২০
৮	৪০
৬	৬০
৪	৮০

সূচিতে দেখা যায় যে, যখন প্রতি কেজি চালের দাম ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হলো ২০ কেজি, দাম কমে যখন ৮ টাকা হয়, তখন চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে ৪০ কেজি হয়েছে। চালের দাম যখন আরও কমে ৬ টাকা হয়, তখন চাহিদার পরিমাণ হলো ৬০ কেজি এবং সবশেষে দাম যখন কমে যখন ৪ টাকা হয়, তখন চাহিদার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে ৮০ কেজি হয়েছে। এটি একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচি।

উপরিউক্ত চাহিদা সূচির ভিত্তিতে নিম্নে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা হলো :

চিত্রে OX অক্ষে চাহিদার পরিমাণ এবং OY অক্ষে দ্রব্যের দাম নির্দেশ করা হলো। চালের দাম যখন প্রতি কেজি ১০ টাকা তখন চাহিদার পরিমাণ হলো ২০ কেজি। OY রেখার ১০ সূচক বিন্দু হতে এবং OX রেখার ২০ সূচক বিন্দু হতে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে তারা পরস্পর A বিন্দুতে মিলিত হবে। A বিন্দুটি চাহিদা রেখার একটি বিন্দু হবে। অনুরূপভাবে, OY রেখার ৮ সূচক বিন্দু হতে এবং OX রেখার ৪০ সূচক বিন্দু হতে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে এরা পরস্পর B বিন্দুতে মিলিত হবে। B বিন্দুটি চাহিদা রেখার অপর একটি বিন্দু হবে। আবার, OY রেখার ৬ সূচক বিন্দু হতে এবং OX রেখার ৬০ সূচক বিন্দু হতে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে এরা পরস্পর C বিন্দুতে মিলিত হবে। C বিন্দুটি চাহিদা রেখার অপর একটি বিন্দু হবে। এভাবে OY রেখার ৪ সূচক বিন্দু হতে এবং OX রেখার ৮০ সূচক বিন্দু হতে দুটি লম্ব অঙ্কন করলে এরা পরস্পর D বিন্দুতে মিলিত হবে। এখন A, B, C ও D বিন্দুগুলো যোগ করে যে DD′ রেখাটি পাওয়া যায়, তা-ই হলো চাহিদা রেখা। এভাবে একটি কাল্পনিক চাহিদা সূচির ভিত্তিতে একটি চাহিদা রেখা অঙ্কন করা যায়।

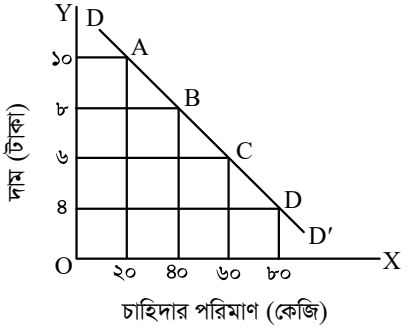

চিত্র : চাহিদা রেখা

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখার মধ্যে কোনো তাত্ত্বিক বিরোধ নেই উভয়ের মধ্যে কিছু উপস্থাপনাগত বা প্রকাশগত পার্থক্য রয়েছে। বস্তুত চাহিদা সূচি ও চাহিদা রেখা হলো একই তথ্য অর্থাৎ দ্রব্যের দামের সাথে চাহিদার পরিমাণের যে সম্পর্ক তা প্রকাশের দুটি ভিন্ন পদ্ধতি মাত্র। উপরিউক্ত বিভিন্ন কাল্পনিক চাহিদা সূচির মানের ভিত্তিতে বিভিন্ন কাল্পনিক চাহিদা রেখা অঙ্কন করা সম্ভব। চাহিদা বিধির গাণিতিক প্রকাশই মূলতঃ চাহিদা সূচি এবং চাহিদা বিধি থেকে প্রাপ্ত সূচির জ্যামিতিক প্রকাশই হলো চাহিদা রেখা।

■ প্রশ্ন : ৪ ॥ ইসলামি ব্যাংক ও গতানুগতিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। সংক্ষেপে ইসলামি ব্যাংক উদ্ভাবনের ক্রম-ইতিহাস বর্ণনা কর।

[Make a distinction between Islamic bank and conventional bank. Briefly discuss the history of foundation of Islamic bank.]

উত্তর।। ভূমিকা : কুরআন মাজিদে বর্ণিত হয়েছে– "আল্লাহ তায়ালা ব্যবসায়কে হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম' (সূরা : আল-বাকারা, আয়াত ২৭৫)। ইসলামি চিন্তাবিদ ও ফকীহগণ (আইনশাস্ত্রবিদ) এ বিষয়ে একমত যে, ইসলামি শরীয়তে সুদ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা শর্তহীন ও চিরন্তন। তাই ইসলামি ব্যাংকের সব লেনদেন সুদমুক্ত। এ ব্যাংক সর্বপ্রকার সুদ যেমন– সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ, উচ্চহার সুদ, নিম্নহার সুদ, উৎপাদনমুখী ঋণের সুদ, ভোগ্যপণ্য ঋণের সুদ এবং বাণিজ্যিক, ব্যক্তিগত, সমষ্টিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক সব ধরনের সুদ পরিহার করে।

➲ ইসলামি ব্যাংক ও গতানুগতিক ব্যাংকের মধ্যে পার্থক্য

প্রচলিত আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার সাথে ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও ব্যাপক বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। নিচে উভয় প্রকার ব্যাংকব্যবস্থার একটি তুলনামূলক আলোচনা লিপিবদ্ধ করা হলো :

১. **সংজ্ঞাগত :** ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যার যাবতীয় আইন-কানুন, রীতি-নীতি ও কার্যাবলি ইসলামি মূল্যবোধের দ্বারা সঞ্চারিত হয়। এটি ইসলামি শরীয়তের নীতিমালার প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ করে এবং এর কোনো কার্যক্রমেই সুদের লেনদেন হয় না। পক্ষান্তরে, প্রচলিত আধুনিক ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি মধ্যস্থতাকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা মূলত সুদের ভিত্তিতে আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান করে।

২. **পরিচালনাগত :** ইসলামি ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম ইসলামি শরীয়ত ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। ব্যাংক তার লেনদেন শরীয়ত মোতাবেক করছে কি না তা তত্ত্বাবধান ও পর্যালোচনার জন্য ইসলামি ব্যাংকে শরীয়া বোর্ড বা শরীয়া কাউন্সিল থাকে। শরীয়তের আদেশ বাস্তবায়ন ও নিষেধাজ্ঞা যথাযথভাবে কার্যকরী করার ব্যাপারে শরীয়া বোর্ড/কাউন্সিলের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পক্ষান্তরে, প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় শরীয়া বোর্ড বা কাউন্সিল জাতীয় কোনো তদারকি বোর্ড থাকে না।

৩. **উদ্দেশ্যগত :** ইসলামি ব্যাংকিং মূলত একটি নৈতিক ধারণা। এর প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর নির্দেশিত ও মহানবী (স)-এর প্রদর্শিত পথে সমাজ ও রাষ্ট্র হতে অর্থনৈতিক জুলুম ও শোষণ নির্মূল করে সুবিচার বা 'ইনসাফ' এর পরিবেশ প্রতিষ্ঠা করে ব্যাপক জনগণের উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে সহায়তা করা। পক্ষান্তরে, আমানত সংগ্রহ এবং তা ঋণদানের মাধ্যমে সর্বাধিক মুনাফা অর্জন করাই প্রচলিত আধুনিক ব্যাংকব্যবস্থার উদ্দেশ্য।

৪. **কার্যগত :** কার্যাবলির দিক থেকেও প্রচলিত ব্যাংকের সাথে ইসলামি ব্যাংকের ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। নিম্নে উভয়ের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দিকের তুলনামূলক আলোচনা করা হলো :

   ক. আমানত সংগ্রহ : ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থায় চলতি হিসাব, লাভ-লোকসান অংশীদারি সঞ্চয়ী আমানত (পি এল এস) হিসাব, লাভ-লোকসান অংশীদারি স্বল্পমেয়াদী তলবী আমানত (পি এল এস এস এন ডি), লাভ-লোকসান অংশীদারি মেয়াদী আমানত (পি এল এসটিডি) হিসাব, বৈদেশিক মুদ্রা আমানত হিসাব খোলা হয়। ইসলামি ব্যাংকে চলতি হিসাব 'আল ওয়াদিয়া' নীতির ভিত্তিতে খোলা হয়। অন্যান্য সকল হিসাব মুদারাবা নীতির ভিত্তিতে খোলা হয় এবং নির্দিষ্ট সময় পরে লাভ বা লোকসান বণ্টন করা হয়। পক্ষান্তরে, প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থায় চলতি হিসাব, সঞ্চয়ী হিসাব এবং মেয়াদী হিসাব খোলা হয়। চলতি হিসাবে কোনো সুদ দিতে হয় না। সঞ্চয়ী ও স্থায়ী হিসাবের আমানতের উপর নির্দিষ্ট হারে সুদ দেওয়া হয়।

   খ. ঋণের তদারকি : প্রচলিত ব্যাংক ঋণ গ্রহীতাদের ঋণ দিয়েই এর দায়িত্ব শেষ করে। ঋণের সঠিক ব্যবহার হচ্ছে কি না তা তদারকি করা হয় না। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বিনিয়োগ করে। তাই এটি বিনিয়োগ কার্যক্রম তদারকি করে এবং বিনিয়োগকারীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করে।

   গ. বিনিয়োগের পদ্ধতি : ইসলামি ব্যাংক মুশারাকা, মুদারাবা, বায়-ই-মুয়াজ্জাল, বায়-ই-সালাম, বায়-ই-মুরাবাহা প্রভৃতি বিভিন্ন পদ্ধতিতে এর আমানতকৃত অর্থসমূহ বিনিয়োগ করে। এসব বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত লাভ-লোকসান ব্যাংক ও গ্রাহক বণ্টন করে নেয়। অপরদিকে প্রচলিত ব্যাংকসমূহ নগদ ঋণ, জমাতিরিক্ত ঋণ, ধার ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের ঋণ প্রদান করে থাকে। সব ধরনের ঋণ পূর্ব নির্ধারিত সুদের ভিত্তিতে প্রদান করা হয়।

   ঘ. ব্যাংক গ্যারান্টি : ইসলামি ব্যাংক এককালীন কমিশনের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে। পক্ষান্তরে, প্রচলিত ব্যাংকসমূহ কমিশন হারের ভিত্তিতে ব্যাংক গ্যারান্টি ইস্যু করে।

৫. **বিনিয়োগের উদ্দেশ্য :** ইসলামি ব্যাংক সমাজ ও রাষ্ট্রের বৃহত্তর কল্যাণ ও উন্নয়নের দিকে লক্ষ রেখে বিনিয়োগ কার্যক্রম পরিচালনা করে। মুনাফা অর্জন করা ব্যাংকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। বিনিয়োগ কার্যক্রমের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিতে মুনাফা অর্জিত হয়ে যায়। এমনকি কোনো কোনো কাজে তাৎক্ষণিক কোনো মুনাফা অর্জিত নাও হতে পারে। অন্যদিকে, প্রচলিত ব্যাংকসমূহ আমানতকারীদের নিকট থেকে স্বল্পসুদের হারে মূলধন সংগ্রহ করে এবং মুনাফার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহীতাদের উচ্চতর সুদের হারে মূলধন সরবরাহ করে। সুতরাং প্রচলিত ব্যাংকসমূহের যাবতীয় বিনিয়োগ কার্যক্রম শুধু মুনাফার উদ্দেশ্যেই পরিচালিত হয়।

৬. **মুনাফা নির্ধারণে :** ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারী, ব্যাংক ও বিনিয়োগ গ্রহীতা এ তিনটি পক্ষই ব্যবসায়ের প্রকৃত অংশীদারে পরিণত হয়। তারা নিট মুনাফা ও দায়-দায়িত্বেরও অংশীদার হয়। অর্থাৎ ইসলামি ব্যাংকে বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতি পরে নির্ধারিত হয়। পক্ষান্তরে, প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় ঋণ গ্রহীতার লাভ-ক্ষতি যাই হোক, সুদের হার পূর্বেই নির্ধারিত থাকে।

৭. **যাকাত প্রদান :** ইসলামি ব্যাংক তার আয় ও সম্পদের উপর যাকাত প্রদান করে থাকে। যাকাতের এই অর্থ গরিব ও নিঃস্বদেরকে দান করা ছাড়াও বহু উন্নয়নমূলক এবং জনকল্যাণমুখী কাজে ব্যয় করা হয়; কিন্তু প্রচলিত ব্যাংক যাকাত প্রদান করে না।

৮. **গ্রাহক-ব্যাংকার সম্পর্ক :** ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় গ্রাহক ও ব্যাংক উভয় পক্ষই লাভ-লোকসানের অংশীদার হয়। এজন্য উভয় পক্ষই তাদের অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও উদ্ভাবনী শক্তিকে সম্মিলিতভাবে কাজে লাগায়। পক্ষান্তরে, প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থায় আমানতকারী, ব্যাংক ও ঋণগ্রহীতাদের মধ্যেকার সম্পর্ক নৈর্ব্যক্তিক ধরনের। এরা একে অন্যের কাজে সংশ্লিষ্ট হয় না এবং দায় দায়িত্বও গ্রহণ করে না। কেননা প্রত্যেক পক্ষই পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ গ্রহণ বা প্রদান করে থাকে।

৯. কাজের পরিধি : ইসলামি ব্যাংকের কাজের পরিধি অনেক বেশি। কেননা এটি একটি বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান। অপরপক্ষে, প্রচলিত ব্যাংকের কাজের পরিধি সীমিত।

১০. সাফল্য :

i. **মুদ্রাস্ফীতি :** ইসলামি ব্যাংক মুদ্রাস্ফীতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেহেতু ব্যাংকের মাধ্যমে অর্থায়ন কোনো উৎপাদন, ক্রয়-বিক্রয় বা ইজারার মাধ্যমে বাজারে দ্রব্যাদি আসতে সহায়তা করে, সেহেতু মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। পক্ষান্তরে, প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার কারণেই মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি পায়।

ii. **কর্মসংস্থান :** ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থায় পূর্ব নির্ধারিত সুদের অস্তিত্ব না থাকায় সম্পদের সর্বাধিক ব্যবহার নিশ্চিত হয়। তাই এ ব্যবস্থা বেকার সমস্যা সমাধানে অনবদ্য অবদান রাখে। পক্ষান্তরে প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংক এর কারণে বেকার সমস্যা আরও প্রকটাকার ধারণ করে। কারণ কোনো বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় নির্ধারিত সুদের হারের চেয়ে কম হলে উক্ত বিনিয়োগে উদ্যোক্তার আগ্রহ হ্রাস পায়। ফলে সম্পদ অব্যবহৃত থাকে এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পায়।

iii. **লাভজনক প্রতিষ্ঠান :** ইসলামি ব্যাংক লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমানত সংগ্রহ করে। এ ব্যবস্থায় প্রকৃত বিনিয়োগ-আয় আমানতকারীগণকে ভাগ করে দেওয়া হয়। এমনকি লোকসান হলে সেটার ভাগও তাদের মধ্যে বণ্টিত হয়। আমানতকারীদের লভ্যাংশ বাজার আনুপাতিক হওয়ার কারণে ইসলামি ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু সুদভিত্তিক ব্যাংকের ইতিহাসে দেখা যায় ব্যাংকগুলো বিভিন্ন কারণে লাভজনক পারছে না, বিশেষ করে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ব্যাংক নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে আমানতকারীগণকে পূর্ব নির্ধারিত হারে সুদ দিতে হয় ব্যাংকের লাভ হোক আর লোকসান হোক।

➲ ইসলামি ব্যাংক উদ্ভাবনের ক্রম-ইতিহাস

বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতিতে ইসলামি ব্যাংকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে এ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস তেমন পুরনো নয়; বরং ইসলামি ব্যাংকিংব্যবস্থার অভিনব ধারণা সাম্প্রতিক কালের। বর্তমান সুদভিত্তিক ব্যাংকিংব্যবস্থার স্থলে সুদমুক্ত অর্থব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ইসলামি পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সম্মেলন জেদ্দায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থা গঠনের ওপর আলোচনা হয়। ফলে ১৯৭৫ সালে ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (Islamic Development Bank) প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় জেদ্দায় অবস্থিত। আর ইসলামি শরীয়াহ অনুসারেই এ ব্যাংক পরিচালিত। এ ব্যাংকের সফল কার্যক্রমের ওপর ভিত্তি করে বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইসলামি ব্যাংক গড়ে উঠছে।

ইসলামি ব্যাংকের উৎপত্তি

সাধারণত মহাজনি ব্যবস্থা থেকে ব্যাংকব্যবস্থার উদ্ভব হয়। প্রাচীনকালে গড়ে ওঠা সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থার বিকল্প বা প্রতিবিধান হিসেবে সুদবিহীন ইসলামি ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। এটি আল্লাহ তায়ালার প্রদত্ত অলঙ্ঘনীয় বিধান। আল্লাহ তায়ালা সুদকে হারাম ঘোষণার পর সুদি কারবার সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। মুদ্রা আদান প্রদানের জন্য প্রচলিত সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা ও ব্যাংকব্যবস্থা অবৈধ ঘোষিত হয়। তদানীন্তন আরব সমাজে গড়ে ওঠা মহাজনি সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। তদস্থলে পরবর্তীতে গড়ে ওঠে ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকব্যবস্থা। সুদপ্রথা হারাম ঘোষণার পর রাসূল (স)-এর সময়, খেলাফত যুগে এবং ইসলামের সোনালী যুগে সুদভিত্তিক কারবার মুসলমানগণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেন। ফলে সুদমুক্ত ব্যাংকব্যবস্থাকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের চিন্তাধারার সূচনা হয়।

খেলাফত যুগে ইসলামি ব্যাংকিং

খোলাফায়ে রাশেদার যুগে 'বায়তুল মাল' কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ভূমিকা পালন করে। এ সময়ে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) মদিনায় দিরহাম জমা করে কুফায় তা ভাঙ্গানোর স্বীকারপত্র লিখে দিতেন। তাঁর ভাই মিসআব ইরাকে সেই স্বীকারপত্র ভাঙ্গিয়ে নগদ অর্থ প্রদান করতেন। উমাইয়াদের রাজতান্ত্রিক শাসনামলে মুসলমানদের ব্যাংকিং লেনদেনের যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়। খ্রিষ্টীয় একাদশ শতকে আলেপ্পোর শাসনকর্তা (আমীর) সাইফুদ্দৌলা হামদানীর শাসনামলে এখনকার হুন্ডির আদলে একরকম অর্থনৈতিক লেনদেনের প্রচলন ছিল। ১০১০ খ্রিষ্টাব্দে বসরায় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে হুন্ডির লেনদেন ও মুদ্রা বিনিময় ব্যবসায়ের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে। পারসিক পর্যটক নাসের খসরুর সফরনামায় খ্রিষ্ট একাদশ শতকের মধ্যভাগে ইরাকের বসরা নগরীতে ব্যাংকিং লেনদেনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

আধুনিক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার সফল বাস্তবায়ন

ষাটের দশক (১৯৫১-৬০) এসে এ গবেষণায় ব্যাপক গতি সঞ্চার হয়। ধীরে ধীরে সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংকিং ব্যবস্থাটি সচেতন মুসলিম জনতার প্রাণের দাবিতে পরিণত হয়। বিষয়টির সম্ভাব্যতা ও বাস্তবায়ন যাচাই করে দেখার জন্য ১৯৬১ সালে মিশরে ইসলামি গবেষণার সর্বোচ্চ কেন্দ্র 'College of Islamic Research' প্রতিষ্ঠা করা হয়। এ ব্যাংকের উদ্ভাবিত পদ্ধতিতে ব্যাংকিং পরিচালনার জন্য ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় পরীক্ষামূলকভাবে 'Palgniemis Sevings Corporation' নামে একটি 'প্রি-ব্যাংকিং সংস্থা গড়ে উঠে। এ ব্যবস্থাটি আশাতীত সফলতা অর্জন করলে পরের বছর ১৯৬৩ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড.

আহমদ আল নাজ্জার মিশরের কায়রো থেকে ১০০ কি. মি. দূরে মিটগামার নামক স্থানে মিটগামার ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেন। লক্ষ করা যায় যে, এ ব্যাংকের ধারাবাহিক সাফল্যের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে মুসলিম বিশ্বে 'ইসলামি ব্যাংকের' প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো গড়ে উঠতে শুরু করে।

১. ইসলামি নীতিমালার আলোকে ১৯৬২ সালে মালয়েশিয়ায় Pilgrims Savings Corporation প্রতিষ্ঠিত হয়।
২. মিশরের মিটগামারে ১৯৬৩ সালে 'সেভিংস ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
৩. ১৯৬৯ সালে মালয়েশিয়ায় 'তাবুং হাজি' নামে একটি বিশেষায়িত ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
৪. ১৯৭০ সালে ওআইসি দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ মুসলিম দেশসমূহে ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন।
৫. ১৯৭১ সালে মিশরের কায়রোতে 'নাসের স্যোসাল ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
৬. ১৯৭৩ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।
৭. ১৯৭৪ সালে ওআইসি দেশসমূহের অর্থমন্ত্রীগণ আইডিবি চার্টারে স্বাক্ষর করেন।
৮. ১৯৭৫ সালে সৌদি আরবের জেদ্দায় ইসলামি উন্নয়ন ব্যাংক (আইডিবি) প্রতিষ্ঠিত হয়।
৯. ১৯৭৫ সালে সংযুক্ত আরব আমিরাতে 'দুবাই ইসলামি ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
১০. ১৯৭৭ সালে সুদানে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
১১. ১৯৭৭ সালে মিশরে 'ফয়সাল ইসলামিক ব্যাংক' প্রতিষ্ঠিত হয়।
১২. ১৯৭৭ সালে কুয়েতে 'কুয়েত ফাইন্যান্স হাউস' প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৩. ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবে 'International Association of Islamic Bank's (IAIB)' গঠিত হয়।
১৪. ১৯৭৮ সালে জর্ডানে 'জর্ডান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৫. ১৯৭৮ সালে আরব আমিরাতে 'জর্ডান ইসলামিক ব্যাংক ফর ফাইন্যান্স অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট' প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৬. ১৯৭৮ সালে পাকিস্তান সমগ্র ব্যাংকব্যবস্থাকে ইসলামিকরণের ঘোষণা দেয়।
১৭. ১৯৮৩ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রথম ইসলামি ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশে 'ইসলামি ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৮. ১৯৮৩ সালে তুরস্ক ও মালয়েশিয়ায় ইসলামি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।
১৯. ১৯৯১ সালে ২৭শে মার্চ বাহরাইনে The Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) বা 'আওইফি' একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিবন্ধিত হয়। এর আগে ১৯৯০ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি আলজিয়ার্সে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি মোতাবেক ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য অ্যাকাউন্টিং, অডিটিং, গভর্নেন্স, ইথিকস এবং শরীয়াহ বিষয়ক স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের লক্ষ্যে 'আওইফি' প্রতিষ্ঠিত হয়।
২০. ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে 'আল-বারাকাহ ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
২১. ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশে 'আল-আরাফাহ ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
২২. ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে 'সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠা লাভ করে।
২৩. ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে 'ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৪. ২০০১ সালে বাংলাদেশে 'শাহজালাল ইসলামি ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৫. শরীয়াহ মূলনীতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আন্তর্জাতিক স্ট্যান্ডার্ড চালু এবং নতুন নতুন স্ট্যান্ডার্ড প্রণয়নের মাধ্যমে একটি দূরদর্শী ও স্বচ্ছ ইসলামি আর্থিক সেবাশিল্পের বিকাশ ঘটানোর লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় International Financial Services Board-IFSB। আইডিবি এবং আওইফি'র সহযোগিতায় বিভিন্ন দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও মনিটারি অথরিটির শীর্ষ নির্বাহীবৃন্দের উদ্যোগে ২০০২ সালের ৩ নভেম্বর কুয়ালালামপুরে আনুষ্ঠানিকভাবে আইএফএসবি যাত্রা শুরু করে।
২৬. ২০০৪ সালে বাংলাদেশে 'এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।
২৭. বিশ্বব্যাপী জাতি, ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য ইসলামি অর্থনীতির ক্ষেত্রে ধর্মীয় ও নৈতিক দিকনির্দেশনা প্রদানে সক্ষম 'নলেজ লিডার' তৈরি করার লক্ষ্যে মালয়েশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংক 'ব্যাংক নেগারা মালয়েশিয়া'র পৃষ্ঠপোষকতায় ২০০৬ সালে মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর এডুকেশন ইন ইসলামিক ফাইন্যান্স' বা (INCEIF) 'ইনসেইফ' শিক্ষার্থীদের ইসলামি অর্থনীতি বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদানের পাশাপাশি মাস্টার্স এবং পিএইচডি ডিগ্রি প্রদানেরও ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
২৮. ২০১৩ সালে বাংলাদেশে 'ইউনিয়ন ব্যাংক লিমিটেড' প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্বে ইসলামি ব্যাংকের আবির্ভাব, বিকাশ ও জনপ্রিয়তা এ সত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে, আধুনিক জগতে ইসলামি অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত সুদমুক্ত ইসলামি ব্যাংক কেবল কোনো তাত্ত্বিক ধারণা নয়, এর বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হয়েছে। ইসলামি ব্যাংকিং আন্দোলন সারা বিশ্বে এখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে বিশ্বব্যাপী শত শত ইসলামি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব, এদের নেটওয়ার্কের বিস্তার এবং কার্যক্রমের অগ্রগতি ও সাফল্য ইসলামি অর্থনীতির কার্যকারিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও সর্বজনীনতা প্রমাণ করে। সুতরাং ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থা প্রচলিত সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থা থেকে উন্নততর তা প্রমাণিত হয়েছে।

■ প্রশ্ন : ৫ ॥ মূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলামি সরকারের ভূমিকা আলোচনা কর।
[Describe the role of an Islamic Government in controlling price.]

উত্তর।। ভূমিকা : ইসলামি সমাজে সম্পদের ন্যায়-বিচারপূর্ণ বণ্টন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ক্রয়-ক্ষমতাকে ধনীদের মধ্যে পুঞ্জীভূত না রেখে গরিব ও দুঃস্থদের মধ্যে সম্প্রসারণের নানা কর্মপন্থা অবলম্বন করা হয়। এজন্য নিত্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যাদির মূল্য এমন স্তরে স্থিতিশীল রাখার চেষ্টা করা হয়, যাতে তা সমাজের গরিব-দুঃখীদেরও আওতার মধ্যে থাকে। তাই ইসলামি মূল্যনীতির অভীষ্ট লক্ষ্য হচ্ছে মানবতার কল্যাণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা।

➲ মূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলামি সরকারের ভূমিকা

মূল্য নিয়ন্ত্রণে ইসলামি সরকারের ভূমিকা নিম্নে আলোচনা করা হলো :

ক. বাজার প্রক্রিয়া তুলে দেয়া : এ বিকল্প ইসলামি অর্থনীতিতে গ্রহণীয় নয়। এ সুস্পষ্ট কারণ হচ্ছে, "ইসলাম কোনো ব্যক্তির মৌলিক অর্থনৈতিক স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে না। ইসলাম শুধুমাত্র ক্ষেত্র বিশেষে, সমাজের সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক দায়িত্ব শক্তিশালী করার লক্ষ্যে অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপের অনুমোদন দান করে।

খ. বাজার প্রক্রিয়া ও হস্তান্তরিত অর্থ প্রদান : এ বিকল্পও ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রহণ করা যায় না। এর পেছনে অন্তত তিনটি যুক্তি দেওয়া যায়। যেমন :

১. এ বিকল্পে ধরে নেওয়া হয় যে, বাজার প্রক্রিয়া আপনা-আপনি চাহিদা এবং যোগানের অদৃশ্য শক্তির দ্বারা দ্রব্য ও সেবার পুনর্বণ্টন সুষম করবে। আধুনিক অর্থনীতির অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে প্রকৃত অবস্থা এ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে।

২. বাজার ব্যবস্থায় হস্তান্তরিত অর্থ প্রদান যে স্থায়ী রূপ নেবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। উন্নয়নশীল দেশের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়, অনেক সময় সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য যেমন– নির্বাচনের পূর্বে ভোট সংগ্রহ করার জন্য গরিব ও দুঃস্থদের সাহায্য দিয়ে থাকে। উদ্দেশ্য হাসিল হলে কিংবা প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে তারা বেমালুম সবকিছু ভুলে যায়। গরিবরা যে সাহায্য পায় তা দিয়ে তারা যদি তাদের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে সমর্থও হয়, তবুও ফসলের উপযুক্ত মূল্য না পাওয়ায় তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন নাও হতে পারে।

৩. লক্ষ করা গেছে, বাজার ব্যবস্থা গরিবদের মৌলিক প্রয়োজনের প্রতি উদাসীন অথবা এ ব্যাপারে কার্যকরি কিছু করতে অক্ষম থাকে।

গ. নিয়ন্ত্রিত বাজার প্রক্রিয়া : এ বিকল্প ব্যবস্থায় ইসলামি বাজার ব্যবস্থাকে সচেতন নিয়ন্ত্রণ, তদারকি ও সহযোগিতার সুসমন্বয় হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। অন্যকথায়, এ ব্যবস্থায় বাজার প্রক্রিয়া অবাধে চলবে, তবে যখন যেখানে প্রয়োজন হবে তখন সেখানে প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণ ও সংশোধনমূলক ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হবে। মান্নান এ প্রসঙ্গে নিম্নের মূল্যনীতির সুপারিশ করেন।

১. **বাজার প্রক্রিয়ার সাথে বিনামূল্যে রেশন ব্যবস্থা :** এ ব্যবস্থায় ধনী লোকদের জন্যে বাজার ব্যবস্থা চালু রেখে গরিব ও দুঃস্থদের জন্যে কুপনের মাধ্যমে বিনামূল্যে রেশন দ্রব্য ও সেবা বিতরণ করা যেতে পারে। রেশনের মাধ্যমে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি গরিবরা বিক্রি করে আয় বাড়াতে পারে, কিংবা নিজেদের প্রয়োজন মেটাতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

২. **সরকারি দ্রব্য ও সেবার জন্য শূন্য মূল্য ব্যবস্থা :** এ নীতি অনুযায়ী গরিব ও দুঃস্থদের জন্যে একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বিনামূল্যে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী (যেমন– পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাস ইত্যাদি) সরবরাহ করা এবং বাকি সকল লোকের মাথাপিছু আয় অনুসারে শ্রেণি বিভাগ করে স্তর অনুসারে মূল্যে দ্রব্য ও সেবা প্রদান করা যেতে পারে। প্রয়োজনীয় পরিমাণে বেশি ভোগ করার ক্ষেত্রে ভোক্তাদের অবশ্যই অধিক মূল্য প্রদান করতে হবে।

৩. **মূল্যনীতির সামাজিকীকরণ :** মূল্যনীতির সামাজিকীকরণের অর্থ হলো, উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা খাতভিত্তিক বা জাতীয় পর্যায়ে একটি 'মার্ক-আপ নীতি' নির্ধারণ করা। এ মার্ক-আপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রান্তিক খরচের চেয়ে গড় খরচ বিবেচনা করা উচিত। এটি দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ থাকবে না; বরং একটি রেঞ্জ নিম্ন ও উর্ধ্বসীমা থাকবে। উৎপাদনের খরচের ওপর নির্ভর করে প্রকৃত মার্ক-আপ সমন্বয় করতে হবে।

৪. **নিয়ন্ত্রিত সমবায় মূল্য :** এটি আরও একটি বিকল্প যার মাধ্যমে ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এ নীতির উদ্দেশ্য হলো এমন একটি মূল্য নির্ধারণ করা যাতে উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়েই উপকৃত হয়। এজন্যে যা দরকার হলো উৎপাদক ও ভোক্তা উভয়কে সমবায় গঠনের জন্যে উৎসাহিত করা। এরূপ নীতি বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে কার্যকর ভূমিকা পালনে এগিয়ে আসতে হবে। প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও সেবাদির মূল্য যাতে অসহনীয় ব্যাপ্তির বাইরে চলে না যায়, তার জন্য ভোক্তার সমবায় গঠন করতে হয়। আবার বিভিন্ন উৎপাদিত দ্রব্যাদির, বিশেষ করে মৌসুমি কৃষিজাত দ্রব্যাদির মূল্য যাতে অসহনীয় ব্যাপ্তির বাইরে চলে না যায় বা একেবারে কম না হয়, তার জন্যে উৎপাদকদের সমবায় গঠন প্রয়োজন। মান্নান বলেন, "এরূপ পরিকল্পনার ইসলামি বৈশিষ্ট্য হলে, উৎপাদক ও ভোক্তাদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে

তোলার ওপর জোর দেওয়া, শুধুমাত্র তাদের নিজেদের মধ্যে সহযোগিতামূলক মনোভাব গড়ে তোলা নয়। এদের স্মরণ করিয়ে দেয়া উচিত যে, উৎপাদক ও ভোক্তারা যেন সবসময় একে অপরকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা না করে। যেখানে চাহিদা ও যোগানের বিপরীতমুখী শক্তির দ্বারা তাদের নিজ নিজ স্বার্থে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যেখানে ক্রেতারা ক্রেতাদের বিরুদ্ধে, বিক্রেতারা বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে এবং ক্রেতারা বিক্রেতাদের বিরুদ্ধে ক্ষতিকর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। এর জন্যে যা দরকার তা হলো, আর্থ-সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো কাঠামোগত সংস্কারসহ ব্যাপক দায়িত্বযুক্ত পুনঃশিক্ষা কর্মসূচী গ্রহণ।"

৫. **মূল্যের জাতীয়করণ :** মূল্যের জাতীয়করণের অর্থ হলো অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য ও সেবার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত দায় প্রচলন করা। যখন তদারকিকৃত প্রতিযোগিতা কিংবা সহযোগিতামূলক মূল্যনীতি কাঙ্ক্ষিত ফল দিতে ব্যর্থ হয়, তখনই এরূপ নীতি গ্রহণের প্রশ্ন আসে। প্রকৃতপক্ষে, এরূপ ক্ষেত্রে একটি ইসলামি রাষ্ট্র উৎপাদনের মৌলিক উপকরণসমূহের মালিকানা নিয়ে তা প্রত্যক্ষ তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বণ্টন করতে পারে। এর সাফল্য নির্ভর করবে প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার দক্ষতা এবং ইসলামি ন্যায়বিচারের প্রতি অবিচল আস্থার ওপর। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে বাজার ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনুপস্থিত বিধায় একেবারে অপরিহার্য না হলে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ না করাই শ্রেয়।

ইসলামি অর্থনীতিতে মূল্যনীতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো, গরিব ও সামাজিক সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত ভোক্তা ও উৎপাদকদের বাজার প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এর জন্যে যা দরকার তার নির্যাস হলো সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে উদ্দীপ্ত স্বেচ্ছামূলক সহযোগিতা, পারস্পরিক সাহায্য ও তাদের ভিত্তিতে যৌথ প্রচেষ্টা চালানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামি সমাজে দ্রব্যমূল্য শুধু ধনীদের নয়; বরং গরিবদেরও যেন নাগালের মধ্যে রাখা যায় সেজন্য নানা ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গরিবদের মধ্যে সম্পদের সম্প্রসারণ, বাজার নিয়ন্ত্রণ এবং বঞ্চিত ভোক্তা ও উৎপাদকদেরও বাজার প্রক্রিয়ায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা ইসলামি মূল্যনীতির অন্যতম লক্ষ্য।

■ প্রশ্ন : ৬ ॥ পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে কী বুঝ? ইসলামে কেন পূর্ণ-প্রতিযোগিতামূলক বাজার পছন্দ করা হয়? আলোচনা কর।

[What do you mean by the perfect competitive market? Why does Islam prefer perfect competitive market? Discuss.]

উত্তর।। ভূমিকা : প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজার দু'প্রকার, যথা– পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার ও অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এমন এক বাজারব্যবস্থা যেখানে বিপুল সংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতা বিদ্যমান থাকে, উৎপাদনকারীর বাজারে প্রবেশ ও প্রস্থানের পূর্ণ অধিকার থাকে; সকল পণ্য সমজাতীয় ও একই গুণসম্পন্ন হয়, সর্বত্র পণ্যের একই দাম বিরাজ করে এবং উৎপাদক প্রতিষ্ঠান কেবল স্বাভাবিক মুনাফা ভোগ করে। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দ্রব্যমূল্য সর্বনিম্ন হয় এবং ক্রেতা ও বিক্রেতা যুক্তিসঙ্গত আচরণ করে থাকে।

➲ পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের সংজ্ঞা

পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলতে এমন এক বাজার ব্যবস্থাকে বুঝানো হয়, যেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর কষাকষির মাধ্যমে কোনো পণ্যের দাম নির্ধারিত হয়। অর্থাৎ পণ্যের চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য বিন্দুতে পণ্যের দাম নির্ধারিত হলে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. অর্থনীতিবিদ **স্পেন্সার**-এর মতে, "পূর্ণ প্রতিযোগিতা নামটি এমন একটি শিল্প বা বাজারকে দেওয়া হয় যেখানে বাজার দাম ও পরিমাণ সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান নিয়ে বহুসংখ্যক ক্রেতা ও বিক্রেতার সকলেই একটি সমজাতীয় দ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হয়।"

২. **মিসেস জোয়ান রবিনসন**-এর মতে, "যে বাজারে প্রতিটি উৎপাদনকারী ফার্মের উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা পরিপূর্ণ স্থিতিস্থাপক, তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।"

৩. অধ্যাপক **পি. এ. স্যামুয়েলসন**-এর মতে, "পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে কোনো কৃষক, ব্যবসায়ী এবং শ্রমিক এতই ক্ষুদ্র অংশ যে, তারা পৃথকভাবে বাজারমূল্যের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে না।"

৪. অধ্যাপক **এ. কুটসোয়ানিস**-এর মতে, "পূর্ণ প্রতিযোগিতা এরূপ বাজার কাঠামো নির্দেশ করে সেখানে ফার্মসমূহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।"

সুতরাং যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতার প্রত্যক্ষ ও পূর্ণমাত্রার প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট দামে দ্রব্য ক্রয়বিক্রয় হয় তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে।

➲ ইসলামে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পছন্দনীয় হওয়ার কারণ

ইসলাম হলো একটি সাম্যের ধর্ম। তাই ইসলামি বাজার নীতির বিশেষ নিয়ম হচ্ছে, স্বাভাবিক গতিতে বাজারে দ্রব্যের যোগান হবে আবার স্বাভাবিক গতিতে বিক্রি হবে। চাহিদা কমবেশি হবার ওপর দ্রব্যমূল্যের গতি ওঠানামা করবে। দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া রাষ্ট্রের জন্য অনুচিত। রাসূল (স)-এর সময় একদা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে জনগণ এসে রাসূল (স)-এর কাছে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণ করে

দিতে আবেদন জানাল। তখন রাসূল (স) বললেন– "প্রকৃতপক্ষে দ্রব্যমূল্য নির্ধারণকারী হচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা। তিনি মূল্য বৃদ্ধি ও হ্রাস করেন। তিনিই হলেন রিযিকদাতা। আমি তো এ অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই যে, কোনো প্রকার যুলুম, রক্তপাত বা ধন-মালের অপহরণ ইত্যাদি দিক দিয়ে আমার ওপর দাবিদার কেউ থাকবে না।" অতএব দেখা যায়, ব্যক্তি স্বাধীনতার ওপর কোনোরূপ প্রয়োজন ছাড়াই হস্তক্ষেপ বা নিয়ন্ত্রণ করা চরম অন্যায়। এক্ষেত্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারই ইসলামের পছন্দনীয় বাজার। কারণ, এ ধরনের বাজারে দামব্যবস্থা অপর কোনো ব্যক্তির প্রভাবে নির্ধারিত হয় না। পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দাম নির্ধারিত হয় চাহিদা ও যোগানের পারস্পরিক প্রভাবের ওপর নির্ভর করে। অর্থাৎ, ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দর-কষাকষির মাধ্যমে দাম নির্ধারিত হয়। আর এসব কারণেই ইসলাম এ ধরনের বাজার ব্যবস্থাকে পছন্দ করে।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে। বাজার সম্পর্কে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়ই জ্ঞান রাখে বলে বিক্রেতা অধিক দাম ধার্য করে ক্রেতাকে ঠকাতে পারে না। এছাড়া বাজারের নির্ধারিত দামে প্রত্যেক ফার্ম বা বিক্রেতা পণ্য বিক্রয় করতে হয় বলে ইসলামে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার পছন্দ করা হয়।

■ প্রশ্ন : ৭ ॥ ইসলামি বিমা কী? ইসলামি বিমার গুরুত্ব আলোচনা কর।

[What is Islamic Insurance? Describe the importance of Islamic Insurance.]

উত্তর।। ভূমিকা : ইসলামি চিন্তাবিদগণ ইসলামি শরীয়তের বিধান ও বাস্তব প্রয়োজনীয়তার ওপর ভিত্তি করে ইসলামি আকিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি বিমা পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন, যার নাম ইসলামি বিমা। ইসলামি বিমা একটি আর্থসামাজিক সহযোগিতা সংস্থা। ভালো কাজে পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার যে নির্দেশ কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, সে নির্দেশের আলোকেই বিমাব্যবস্থায় 'তাকাফুল' বা ইসলামি বিমার যাত্রা আরম্ভ হয়।

➲ ইসলামি বিমার সংজ্ঞা

ইসলামি বিমার আরবি প্রতিশব্দ হলো التكافل الاسلامى; তাকাফুল শব্দের অর্থ যৌথ গ্যারান্টি, যৌথ জামিননামা, সামষ্টিক নিশ্চয়তা প্রভৃতি। ইসলামি বিমা বা তাকাফুল বলতে এমন এক বিমাব্যবস্থাকে বুঝায়, যে বিমা ইসলামি শরীয়তের বিধিবিধান মেনে চলে, সম্পূর্ণ সুদমুক্ত থাকে। একটি শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে বিনিয়োগ নির্ধারিত হয়।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. প্রখ্যাত ইসলামি বিমা ব্যক্তিত্ব **এম. তাজুল ইসলামের** মতে, "তাকাফুল হলো একদল সদস্য বা অংশগ্রহণকারীর মধ্যে একটি চুক্তি যাতে তারা নিজেদের মধ্যে একে অন্যের জন্য চুক্তিতে উল্লিখিত ক্ষতি বা লোকসানের ক্ষতিপূরণের যৌথ জামানত দিতে সম্মতিভুক্ত হয়।"

২. **মালয়েশিয়ান তাকাফুল আইন ১৯৮৪-তে** তাকাফুলের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "তাকাফুল মানে হচ্ছে, এটা এমন একটি প্রকল্প ব্যবস্থা যা ভ্রাতৃত্ব, সহমর্মিতা ও পারস্পরিক সহযোগিতায় পরিচালিত, যা অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক আর্থিক সহযোগিতা প্রদানের ব্যবস্থা করে, যেখানে অংশগ্রহণকারীগণ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে এ ধরনের আর্থিক সহায়তার জন্য সম্মত থাকে।" (Takaful means a scheme based on brotherhood, solidarity and mutual assistance, which provides for mutual financial aid and assistance to the participants in case of need whereby the participants mutually agree to contribute for the purpose.)

৩. সিয়ারিকাত তাকাফুল মালয়েশিয়া বারহাদ এ (Syarikat Takaful Malaysia Berhad– STMB) এর প্রাক্তন চেয়ারম্যান **ড.** আবদুল **হালিম বিন হাজী ইসমাঈল** তাকাফুলের যে নীতিমালা ব্যাখ্যা করেছেন তা হচ্ছে, "বিমার মাধ্যমে ঝুঁকি গ্রহণের শরীয়াহসম্মত ব্যবসায় মূলত ইসলামি নীতিমালা আল-তাকাফুল এবং আল-মুদারাবার উপর প্রতিষ্ঠিত। সংক্ষেপে আল-তাকাফুলের অর্থ হচ্ছে, এক দলের সদস্যদের মধ্যে স্বেচ্ছায় একে অন্যের মধ্যে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মুনাফার ভাগাভাগি করার লক্ষ্যে ব্যবসায়িক উদ্যোগ এর জন্য অর্থ প্রদানকারী (অংশগ্রহীতা) এবং উদ্যোক্তা যিনি প্রকৃতপক্ষে ব্যবসায় পরিচালনা করেন, তাদের মধ্যে একটি চুক্তি। কোম্পানি কর্তৃক পরিচালিত ইসলামি বিমা ব্যবস্থা বা তাকাফুল ব্যবসায় অর্থ হচ্ছে, এটা একটি মুনাফায় অংশগ্রহণ ও ভাগাভাগি করার জন্য এমন একটি ব্যবসায়িক উদ্যোগ যা দ্বারা একটি কোম্পানি 'অপারেটর' এবং একটি দলবদ্ধ অংশ্রহণকারী সদস্যদের মধ্যে একটি চুক্তি যার মাধ্যমে পরস্পর স্বেচ্ছায় একে অন্যের বিপদে ও ক্ষতিতে পরস্পরকে ক্ষতিপূরণের অঙ্গীকার করে।"

৪. **কাজী মোঃ মোরতুজা আলীর** মতে, তাকাফুল হচ্ছে, "একজনের প্রয়োজনে অন্যজন শরিক হওয়া। তাকাফুল স্কিমের অধীনে এর সদস্যগণ কিংবা অংশগ্রহণকারিগণ দলবদ্ধভাবে এ কথায় সম্মত হন যে, তাদের নিজেদের যে-কোনো নির্দিষ্ট দুর্বিপাকে বা দুর্ঘটনায় লোকগণ ক্ষতির বিপরীতে বিপদ লাঘবের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়।" (Takaful means to take care of ones needs under takaful scheme the member or the participants in a group agree to jointly guarantee themselves against loss or damage counsel by specified perils.)

➲ ইসলামি বিমার গুরুত্ব

ধর্মীয়, ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রভৃতি কারণে ইসলামি বিমার গুরুত্ব রয়েছে। নিচে ইসলামি বিমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করা হলো :

ক. ধর্মীয় জীবনে ইসলামি বিমার গুরুত্ব : ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামি বিমার গুরুত্ব অপরিসীম। সাধারণভাবে বিমাকে ধর্মীয় কোনো কাজ মনে না হলেও মানুষের ধর্ম সম্মত আর্থিক জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে বিমা বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

১. **ইবাদত কবুলের মাধ্যম :** ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য জীবিকা হালাল হওয়া শর্ত। যে হালাল জীবিকা গ্রহণ করে তার ইবাদত কবুল হয় আর যে হালাল জীবিকা গ্রহণ করে না তার ইবাদত কবুল হয় না। মহানবী (স) বলেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

অর্থাৎ, "যে গোশত হারাম থেকে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। যে সকল গোশত হারাম মাল থেকে গঠিত তার দোযখই শ্রেষ্ঠ স্থান।" (আহমদ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাকী ঈমান অংশে বর্ণনা করেছেন।)

হালাল জীবিকা উপার্জনে ইসলামি বিমা একটি সহায়ক মাধ্যম। এছাড়া সুদমুক্ত এবং ইসলামি শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় এ বিমা হালাল উপার্জনের প্রেরণা। মোটকথা হালাল জীবিকার যোগানদাতা হিসেবে ইসলামি বিমা ইবাদত কবুলের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

২. **হালাল উপার্জনের নিশ্চয়তা বিধান :** হালাল উপার্জনের গুরুত্ব সম্পর্কে মহানবী (স) ঘোষণা করেন–

طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

অর্থাৎ, "হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা ফরযের পরে ফরয।" (বায়হাকী ঈমান অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন।)

তাই মুসলমানদের জন্য হালাল উপার্জন করা ফরয তথা অত্যাবশ্যক। ইসলামি বিমা ব্যবসায় বিমার শেয়ারহোল্ডার ও বিমা গ্রহীতাদের জন্য হালাল উপার্জন নিশ্চিত করে। ইসলামি বিমা সুদভিত্তিক লেনদেন পরিত্যাগ করে। তাবাররু ও মুদারাবা নীতির অবলম্বনের কারণে এতে অনিশ্চয়তা, অস্বচ্ছতা ও জুয়ার কোনো উপাদান থাকে না। এসকল কারণে ইসলামি বিমার উপার্জন হালাল ও বৈধ।

৩. **হালাল পদ্ধতিতে বিমাকরণ :** ইসলামি বিমা মুসলমানদেরকে হালাল পদ্ধতিতে বিমা করার সুযোগ দিয়েছে। কারণ ইসলামি বিমার নীতি, আদর্শ, পরিচালনা পদ্ধতি এবং কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে ইসলামি শরীয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে।

খ. ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি বিমার গুরুত্ব : ব্যক্তিগত জীবনে ইসলামি বিমার গুরুত্বগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো :

১. **অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি :** ইসলামি বিমার পদ্ধতি এমন যে, একবার কেউ বিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হলে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পলিসিটি চালু রাখার জন্য প্রিমিয়াম পরিশোধ করে যেতে হয়। এ প্রিমিয়ামের অর্থ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তোলন করা যায় না। কাজেই অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

২. **সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতি প্রতিরোধক :** মানুষ ব্যক্তিগত জীবনে যে-কোনো কাজকর্মের ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। ইসলামি বিমা এসব ক্ষতির ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে এবং প্রয়োজনে সম্ভাব্য ঝুঁকি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিমা প্রতিষ্ঠান মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে থাকে।

৩. **লাভজনক বিনিয়োগ :** ইসলামি বিমার মাধ্যমে মানুষ হালালভাবে অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ লাভ করে। বিমার মেয়াদ পূর্তির পরে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সে এককালীন হিসেবে একটি মোটা অঙ্কের অর্থ পায়। এ অর্থ কোনো লাভজনক ব্যবসায় বিনিয়োগ করে সে নিজের ও দেশের সমৃদ্ধি নিশ্চিত করতে পারে।

৪. **দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা :** ব্যক্তিগত অথবা ব্যবসায়িক ঝুঁকি প্রতিরোধের জন্য বিমা করা হয়। কোনো কারণে লোকটি মারা গেলে অথবা ব্যবসায়ে বিপর্যস্ত হলে বিমাদাবির টাকা পরিশোধ করা হয়। তাই মৃত ব্যক্তির পরিবার সর্বস্বান্ত হয় না। ব্যবসায়ীও দেউলিয়াত্ব থেকে রক্ষা পায়।

৫. **বিপদের প্রতিরক্ষা বিধান :** ব্যক্তিজীবনে যাতে কোনো বিপদাপদ না আসতে পারে অথবা আসলেও যাতে ন্যূনতম ক্ষয়ক্ষতি হয় তার জন্য বিমাকারী বিমাগ্রহীতাকে প্রাক সতর্কতা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ, উপদেশ ও সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করে থাকে।

৬. **নিশ্চয়তা দান :** মানুষের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে সীমাহীন অনিশ্চয়তা পরিলক্ষিত হয়। ইসলামি বিমা মানুষের ব্যক্তিগত অনিশ্চয়তা দূর করে তার চলার পথকে সহজ ও চিন্তামুক্ত করে। নির্ধারিত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে বিমাগ্রহীতা বিমাকৃত বিষয়ের ঝুঁকি সম্পর্কে নিশ্চয়তা বোধ করে। কেননা বিমাকৃত বিষয়বস্তুতে কোনো ক্ষতি বা লোকসান হলে চুক্তি মোতাবেক বিমা প্রতিষ্ঠান তাকে ক্ষতিপূরণ দান করবে।

৭. **নিরাপত্তা প্রদান :** পরিবার ও ব্যক্তির কোনো বিপদাপদ, দুর্ঘটনা, মৃত্যু প্রভৃতি কারণে কোনো ক্ষতি হলে উক্ত বিষয়ের ওপর বিমা করা থাকলে বিমা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিতে তার নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। ক্ষতি বা লোকসান যাতে না হয় সেজন্য বিমাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

৮. **ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলা :** ইসলামি বিমা মানুষকে পরনির্ভরশীলতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে এবং স্বাবলম্বী করে তোলে। মেয়াদ উত্তীর্ণ বিমা অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়া বিমার অর্থ ব্যক্তিকে যে-কোনো অবস্থায় অপরের বোঝা হওয়ার বিড়ম্বনা থেকে রক্ষা করে থাকে।

৯. **শেষ বয়সের অবলম্বন :** সক্ষম বয়সের বিমা অক্ষম বয়সের আর্থিক নিরাপত্তা দান করে থাকে। মেয়াদ উত্তীর্ণ বিমার অর্থ পেনশনের মতো গ্রহণ করে ভাবনাহীনভাবে জীবন কাটানো সম্ভব হয়।

গ. **ইসলামি বিমার সামাজিক গুরুত্ব :** ইসলামি বিমার সামাজিক গুরুত্ব নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

১. **সচ্ছল জীবনযাপনের সুবিধা :** ইসলামি বিমা মানুষকে সঞ্চয়ী করে তোলে। সঞ্চয় মানুষের দুর্দিনের বন্ধু। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় সচ্ছল মানুষ বিমার কল্যাণে যে-কোনো খারাপ সময়েও সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে। বিমার ক্ষতিপূরণের অর্থ অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ বিমা তার সচ্ছলতা নিশ্চিত করে থাকে।

২. **সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে :** ইসলামি বিমা সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে কোনো প্রকার অসঙ্গতি অথবা অনিয়ম ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর। সামাজিক উৎকর্ষতার ভিত্তি ভেঙে দেয়। আর্থিক অসঙ্গতি অক্ষম ব্যক্তিদেরকে নানারকম অসাধুতার পথ অবলম্বনে বাধ্য করে। ইসলামি বিমা এ অব্যবস্থা নিরসন করে। মেয়াদোত্তীর্ণ বিমা তহবিল বা ক্ষতিপূরণের অর্থ ব্যক্তিকে সামাজিক নিরাপত্তা দান করে থাকে।

৩. **জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন :** মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ইসলামি বিমা সহায়তা করে। বিমার মাধ্যমে ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত শিক্ষা, গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত ঝুঁকির বিপক্ষে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও সুষ্ঠু তদারকির ব্যবস্থা থাকে। তাই সমষ্টিগত সামাজিক উন্নয়ন ঘটে।

ঘ. **ইসলামি বিমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব :** বিমার আর্থিক গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে ইসলামি বিমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি :** বিমার একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পলিসি ভেঙে সাধারণত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ না থাকায় মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করে থাকে। ব্যক্তির বাধ্যতামূলক সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয়কে বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

২. **অর্থের নিরন্তর যোগান :** অর্থনীতি হলো একটি দেশের চালিকাশক্তি। যে দেশের অর্থনীতি যত উন্নত সে দেশ তত উন্নত। অর্থনৈতিক কার্যক্রমের ক্রমাগত পরিমাণ ও মান বৃদ্ধি একটি দেশকে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। আর অর্থনৈতিক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজন অর্থের অবাধ যোগান দেওয়া। ইসলামি বিমা অর্থের নিরন্তর ও অবিরাম সরবরাহ নিশ্চিত করে থাকে।

৩. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** ইসলামি বিমা নতুন নতুন কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রথমত বিমা প্রতিষ্ঠান নিজেই কিছু কাজের ব্যবস্থা করে। বিমা প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে। তারপর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া অথবা ক্ষতিপূরণ নেওয়া বিমার অর্থে ছোট ছোট অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিমা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নিজেও কলকারখানা স্থাপন করে। ফলে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৪. **মূলধন গঠনে সহায়তা প্রদান :** ইসলামি বিমা প্রতিষ্ঠান বিমা গ্রহীতাকে দীর্ঘসময় ধরে সঞ্চয় করার সুযোগ দিয়ে থাকে। বিমার মেয়াদ পূর্ণ হলে অথবা ক্ষতিপূরণের মতো কোনো ক্ষতি বা লোকসান হলে একসাথে অনেক টাকা পাওয়া যায়। এ অর্থ মূলধন হিসেবে বিভিন্ন ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা যেতে পারে। তাই বিমার মেয়াদি সঞ্চয় মূলত মূলধন গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে।

৫. **আমদানি-রপ্তানি প্রক্রিয়া সহজকরণ :** দ্রব্যসামগ্রী আমদানি-রপ্তানিতে নানা রকম ঝুঁকি থাকে। ইসলামি বিমা প্রতিষ্ঠান এ ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। ফলে দ্রব্যাদি আমদানি-রপ্তানি সহজতর হয়।

৬. **উদ্যোক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি :** ইসলামি বিমা বিভিন্ন পর্যায়ের সঞ্চয়কারীদের নিকট মেয়াদ শেষে বা ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে একটি বড় অঙ্কের মূলধন প্রদান করে। সঞ্চয়কারীরা এ মূলধন ব্যবসায়-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করে থাকে। এভাবে উদ্যোক্তাদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকে।

৭. **মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস করে :** অর্থের অবাধ সরবরাহ, প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান, উৎপাদনের গতি অব্যাহত রাখা প্রভৃতির মাধ্যমে ইসলামি বিমা মুদ্রাবাজার স্বাভাবিক রাখতে সহায়তা প্রদান করে থাকে। ফলে মুদ্রাস্ফীতি হ্রাস পায়।

উপসংহার : সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইসলামি বিমা (তাকাফুল) বলতে এমন বিমা ব্যবস্থাকে বোঝায় যা একটি শরীয়াহ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ইসলামি শরীয়াহর বিধি-নিষেধ মেনে চলে, সম্পূর্ণরূপে সুদমুক্ত লেনদেন করে এবং বিমার সদস্যদের সাথে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক বজায় রেখে পারস্পরিক ঝুঁকি বণ্টনের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে। মানবজীবনে ইসলামি বিমার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামি বিমার মাধ্যমে ব্যক্তি সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করে এবং ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

■ প্রশ্ন : ৮ ॥ মুদ্রাস্ফীতি কাকে বলে? মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বর্ণনা কর।

[What is inflation? Describe the effects of inflation.]

উত্তর।। ভূমিকা : মুদ্রাস্ফীতি বলতে এমন এক অবস্থাকে বোঝায় যে অবস্থায় মুদ্রার মূল্য ক্রমাগত কমতে থাকে অর্থাৎ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্যসামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস পেতে থাকে। সাধারণত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহে মুদ্রাস্ফীতির প্রকোপ বেশি দেখা যায়। মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতিতে এক বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। কারণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে মুদ্রার ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। এর ফলে বাজারে কাঙ্ক্ষিত দ্রব্য ক্রয় করতে বেশি পরিমাণ মুদ্রা ব্যয় করতে হয়।

➲ মুদ্রাস্ফীতির সংজ্ঞা

সাধারণভাবে বলা যায়, যে পরিস্থিতিতে দ্রব্যসামগ্রী বৃদ্ধির তুলনায় মুদ্রা ও ব্যাংক ঋণের পরিমাণ অধিক বৃদ্ধি পেয়ে সাধারণ দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। যখন মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি পায়; কিন্তু দ্রব্য ও সেবার যোগান সে অনুপাতে বৃদ্ধি পায় না তখন মুদ্রার মূল্যের স্থিতিসাম্যে অসমতা দেখা দেয়। ফলে দেশে সাধারণত দামস্তর বৃদ্ধি পায়। এ পরিস্থিতিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

বিভিন্ন অর্থনীতিবিদ মুদ্রাস্ফীতির বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেছেন। নিম্নে কিছু সংজ্ঞা উপস্থাপন করা হলো :

১. অর্থনীতিবিদ **ক্রাউথার (Crowther)** বলেন, 'মুদ্রাস্ফীতি হলো এমন এক অবস্থা যখন অর্থের মূল্য ক্রমাগত হ্রাস পায় এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।"

২. অর্থনীতিবিদ **কুলবর্ণ (Coulborn)** এর মতে, "মুদ্রাস্ফীতি হলো এমন একটি পরিস্থিতি যেখানে অত্যধিক পরিমাণ অর্থ অতি সামান্য পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রীর পশ্চাতে ধাবিত হয়।" (Inflation is such a situation when too much money chases too few goods)

৩. অধ্যাপক **হট্রে (Hawtrey)** বলেন, "অত্যধিক অর্থের প্রচলনকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।" (Too much supply of money is inflation.)

৪. অধ্যাপক **পিগু** বলেন, "যখন আয়-সৃষ্টিকারী কাজ অপেক্ষা মানুষের আর্থিক আয় অধিক হারে বৃদ্ধি পায় তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়।" (Inflation exists when money income is expanding more than in proportion to income-earning activity.)

৫. অধ্যাপক **স্যামুয়েলসন** এর মতে, "দ্রব্যসামগ্রী এবং উৎপাদনের উপাদানসমূহের দাম যখন বৃদ্ধি পেতে থাকে সাধারণভাবে তখন তাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়।" (By inflation are mean a time of generally rising prices of goods and factors of production.)

৬. **লর্ড কেইনস** এর মতে, "যখন দ্রব্যসামগ্রীর মোট যোগানের তুলনায় কার্যকর চাহিদা বেশি হয় তখন সেই অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।"

➲ মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল

মুদ্রাস্ফীতির ফলাফল বা প্রভাবকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন– ক. সম্পদ এবং আয় বণ্টনে প্রভাব, খ. উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব, গ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব এবং ঘ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর প্রভাব। নিম্নে এগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হলো–

ক. সম্পদ এবং আয় বণ্টনে প্রভাব : মুদ্রাস্ফীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বা ফলাফল হলো এটি আয়কে পূর্ণ বণ্টন করে এবং সম্পদকে এক শ্রেণির কাছ থেকে অন্য শ্রেণির কাছে পূর্ণ বিন্যাস করে। মুদ্রাস্ফীতি সাধারণত নির্দিষ্ট আয় অর্জনকারী শ্রেণিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, ব্যবসায়ী, উৎপাদনকারী এবং পরিবর্তনশীল আয় অর্জনকারীকে লাভবান করে। মুদ্রাস্ফীতি আয় সম্পদের পূর্ণ বণ্টনের মাধ্যমে কীভাবে একশ্রেণির লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং অন্যশ্রেণির লোকদেরকে লাভবান করে তা নিম্নে দেখানো হলো–

১. মুদ্রাস্ফীতির ফলে স্থির আয়ের জনগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
২. ব্যবসায়ী শ্রেণি মুদ্রাস্ফীতির ফলে লাভবান হয়। এ কারণে গরিবের কাছ থেকে ধনী শ্রেণির হাতে সম্পদ চলে যায়।
৩. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋণদাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ঋণগ্রহীতা লাভবান হয়। কারণ ঋণ ফেরত দেওয়ার সময় তার প্রকৃত মূল্য কমে যায়।
৪. মুদ্রাস্ফীতির ফলে করদাতা লাভবান হয়। কারণ করভার হ্রাস পায়।
৫. পেনশন ভোগী মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ তাদের পেনশনের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পায়।
৬. স্থির আয় অর্জনকারী সম্পদ, যেমন– নগদ অর্থ, সঞ্চয় আমানত, স্থায়ী আমানত, বন্ড, ডিবেঞ্চার এর মালিকগণ মুদ্রাস্ফীতির ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কারণ নির্দিষ্ট আয় অর্জনকারী সম্পদ, যেমন– বন্ড, স্থায়ী আমানত প্রভৃতি থেকে প্রাপ্ত আয়ের প্রকৃত মূল্য হ্রাস পায়।

খ. উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব : উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর প্রভাব কেমন হবে তা নির্ভর করে মুদ্রাস্ফীতির ধরনের ওপর। অর্থাৎ এটি নির্ভর করে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি না খরচজনিত মুদ্রাস্ফীতি তার ওপর। তাই উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের ওপর মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব নিয়ে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।

১. অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, অপূর্ণ নিয়োগের পূর্বে চাহিদাজনিত মুদ্রাস্ফীতি উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। অর্থাৎ অর্থনীতিতে অপূর্ণ নিয়োগ অবস্থা বিরাজ করলে মুদ্রাস্ফীতি ব্যবসায়ীদের মুনাফা বাড়ায়। ফলে অতিরিক্ত মুনাফা লাভের আশায় উৎপাদনকারীগণ উৎপাদন বৃদ্ধি করে, ফলে কর্মসংস্থান বেড়ে যায়। এ কারণে কোনো কোনো অর্থনীতিবিদ যুক্তি দেখান যে, "There exists trade off between output and inflation of between employment and inflation"। কিন্তু অর্থনীতিতে খরচজনিত মুদ্রাস্ফীতি দেখা দিলে সামগ্রিক যোগান রেখা বামে স্থানান্তরিত হয়। ফলে উৎপাদন হ্রাস পায়। যেমন : ১৯৭০ এর দশক এবং ১৯৭৯-৮০ সালে OPEC কর্তৃক জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ফলে সাথে সাথে উৎপাদন হ্রাস পেয়েছিল এবং বেকারত্বও বেড়ে গিয়েছিল। এ অবস্থাকে Stagflation বলা হয়।

২. লম্ফমান মুদ্রাস্ফীতির (galloping inflation) ক্ষেত্রে দামস্তর এত দ্রুত বাড়ে যে, উৎপাদন করে যে মুনাফা পাওয়া যায় তার চেয়ে মজুত বৃদ্ধি করে বেশি মুনাফা পাওয়া সম্ভব। ফলে অনুৎপাদনশীল ব্যবসায় মূলধন খাটানো হয়।

৩. মুদ্রাস্ফীতির হার বেশি হলে শ্রমিকরা মজুরি বৃদ্ধির দাবি তোলে এবং শ্রমিক-মালিক বিরোধ দেখা দেয়। ফলে ধর্মঘট, লকডাউট প্রভৃতির মাধ্যমে উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়।

৪. মুদ্রাস্ফীতির ফলে জনগণের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায় বলে সঞ্চয় কমে যায়। ফলে বিনিয়োগ কমে যায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়।

৫. মুদ্রাস্ফীতির ফলে যে-কোনো ধরনের ব্যবসায় বিনিয়োগে মুনাফা বৃদ্ধি পায়। এতে উৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগের পরিবর্তে অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগ হয়।

গ. দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রভাব : অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন, দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে creeping অথবা mild inflation ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে। আর এ যুক্তির সমর্থনে তারা অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্পোন্নত দেশসমূহের মুদ্রাস্ফীতির হার এবং তাদের প্রবৃদ্ধিকে তুলে ধরেন। তাদের মতে, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি ছিল মুদ্রাস্ফীতির ফলে সৃষ্ট উৎপাদনকারীদের উচ্চ মুনাফা অর্জন (high profit margin)। তাই জাতীয় আয়ের মুনাফার পরিমাণ বেশি হওয়ায় উচ্চ আয় শ্রেণিভুক্ত জনগণের সঞ্চয় প্রবণতা গরিব শ্রেণির লোকদের তুলনায় বেশি হওয়ার কারণে বিনিয়োগ বাড়ে এবং উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বর্তমানে এটা সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত যে মূলধন গঠনে মুদ্রাস্ফীতি ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। এর অনেক কারণ থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো নিম্নরূপ–

১. অধিক হারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থের ক্রয়ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে জনগণ অধিক খরচে উৎসাহী হয়ে পড়ে। ফলে তাদের ভোগ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং সঞ্চয় হ্রাস পায়। এছাড়াও অধিক হারে মুদ্রাস্ফীতির ফলে সঞ্চয়ের প্রকৃত মূল্য কমে যায় এবং জনগণ সঞ্চয়ে অনুৎসাহী হয়ে পড়ে। সুতরাং, মুদ্রাস্ফীতি শুধু সঞ্চয়ের স্পৃহাই কমায় না বরং সঞ্চয়ের ক্ষমতাও (ability to save) কমায়।

২. মুদ্রাস্ফীতি স্বর্ণ, জুয়েলারি, রিয়েল এস্টেট, বাড়ি তৈরি প্রভৃতি অনুৎপাদনশীল খাতে বিনিয়োগে উৎসাহী করে। এ ধরনের অনুৎপাদনশীল সম্পদ অর্থনীতির উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ায় না।

৩. মুদ্রাস্ফীতির সবচেয়ে বড় অনাকাঙ্ক্ষিত ফলাফল হলো এটি উন্নয়নশীল দেশগুলোতে গরিব মানুষের জীবনযাত্রার মানকে আরও নিম্নে নামিয়ে দেয়। এ কারণে প্রায়শই বলা হয় মুদ্রাস্ফীতি হলো এক নম্বর শত্রু। মুদ্রাস্ফীতির কারণে গরিব জনগণ তাদের মৌলিক চাহিদা (basic need) পূরণ করতে পারে না বলে নিম্নতম জীবন নির্বাহী স্তরও বজায় রাখতে ব্যর্থ হয়।

ঘ. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর প্রভাব : মুদ্রাস্ফীতি লেনদেনের ভারসাম্যে প্রতিকূল প্রভাব ফেলে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করে। যেমন–

১. মুদ্রাস্ফীতির কারণে দেশীয় পণ্যের দাম আন্তর্জাতিক বাজারে বৃদ্ধি পায়। ফলে রপ্তানি হ্রাস পায়।

২. দেশীয় ক্রেতারা স্বদেশি পণ্যের তুলনায় আমদানিকৃত দ্রব্য সস্তায় পায়। ফলে আমদানি বৃদ্ধি পায়।

৩. দেশীয় মুদ্রার বিনিময় হার হ্রাস পায় এবং

৪. লেনদেনে ঘাটতি দেখা দেয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মুদ্রাস্ফীতি দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির একটি প্রক্রিয়া। এটি কেবল উচ্চ দ্রব্যমূল্য নির্দেশ করে না, একই সাথে মোট চাহিদা ও যোগানের অভারসাম্যহেতু মুদ্রাস্ফীতি জন্ম নেওয়ার বিষয়টি প্রকাশ করে। সুতরাং যখন কোনো দেশে প্রচলিত অর্থের পরিমাণ উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রীর তুলনায় অধিক হওয়ার ফলে দামস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে তখন সে অবস্থাকে মুদ্রাস্ফীতি বলা হয়। মুদ্রাস্ফীতির বহুমুখী প্রভাব বা ফলাফল বিদ্যমান রয়েছে। এগুলো কিছু উপকারী এবং কিছু অপকারী। তবে একথা সত্য যে, মুদ্রাস্ফীতি সঠিকভাবে প্রত্যাশিত হলে এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব নস্যাৎ হয়ে যায়। তথাপিও মুদ্রাস্ফীতির ক্ষতিকর প্রভাবের পাল্লাই ভারী। তবে মৃদু মুদ্রাস্ফীতি অর্থনীতির জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে।

■ প্রশ্ন : ৯ ॥ ভোগ বলতে কী বুঝ? ভোগ সম্পর্কে ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি আলোচনা কর।

[What do you mean by consumption? Discuss the views of Islamic Economics regarding consumption.]

উত্তর।। ভূমিকা : অর্থনীতিতে ভোগ বলতে ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে বুঝায়। তবে কোনো ব্যক্তি কোনো দ্রব্যকে ভেঙ্গে, পুড়ে বা সমুদ্রে নিক্ষেপ করে এর উপযোগ ধ্বংস করলে, তাকে অর্থনীতিতে ভোগ বলা যায় না। ভোগ হতে হলে স্বাভাবিক ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করতে হবে।

➲ ভোগের সংজ্ঞা

অভাব পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের মাধ্যমে কোনো দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকে ভোগ বলে। অর্থনীতিতে ভোগ বলতে দ্রব্যের উপযোগ নিঃশেষ করাকেই বুঝায়। মানুষ দ্রব্য উৎপাদনের মাধ্যমে যেমন উপযোগ সৃষ্টি করে তেমনি ভোগের মাধ্যমে উপযোগ ধ্বংস করাকেই ভোগ বলা হয় না। যেমন : একটি টেবিল যদি আগুনে পুড়ে যায় তবে তার উপযোগ ধ্বংস হবে ঠিকই কিন্তু একে ভোগ বলা যায় না।

অতএব, অভাব মোচন ছাড়া অন্য কোনো ভাবে দ্রব্যের উপযোগ ধ্বংস করা হলে তাকে ভোগ বলা যায় না। তবে উল্লেখ্য, কতগুলো দ্রব্য একবার মাত্র ব্যবহার করলেই ভোগ শেষ হয়ে যায়। যেমন– খাদ্যদ্রব্য। আবার এমন কিছু দ্রব্য আছে যেগুলো বেশ কিছুকাল যাবৎ ব্যবহার করা যায়। যেমন : চেয়ার, টেবিল, টেলিভিশন ইত্যাদি।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

১. **ড. এম. এ. মান্নানের** মতে, অভাব মেটানোর উদ্দেশ্যে বস্তু ও সেবার ব্যবহারকে বলা হয় ভোগ। ভোগ সম্পর্কে আল কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে– "হে ঈমানদারগণ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র তা থেকে ভোগ কর।" কিন্তু শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

২. অর্থনীতিবিদ **মেয়ার্স** বলেন, "Consumption is the direct and final use of goods and services to satingy the wants of free human beings." অর্থাৎ, ভোগ হলো মানুষের অভাব পরিতৃপ্তির জন্যে দ্রব্যসামগ্রী ও সেবাকর্মের প্রত্যক্ষ এবং চূড়ান্ত ব্যবহার।

➲ ভোগ সম্পর্কে ইসলামি অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গি

ভোগনীতির ক্ষেত্রে ইসলামি অর্থনীতিতে নৈতিকতা প্রধান। ইসলামে মানুষের ইহজাগতিক প্রয়োজনকে সীমিত করে তার শক্তি ও মন-মানসিকতাকে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যে নিয়োজিত করার প্রয়াস রয়েছে। মানুষের অভ্যন্তরীণ শক্তির উৎকর্ষ সাধনই ইসলামের মূল উদ্দেশ্য। প্রচলিত অর্থনীতির ভোগতত্ত্বের অবিমিশ্র বস্তুবাদী প্রবণতা ইসলামে স্বীকৃত নয়। ভোগ সম্পর্কে ইসলামি নীতির মৌলিক দিক হচ্ছে, কৃত্রিম মনস্তাত্ত্বিক কারণে সৃষ্ট মানুষের সংখ্যাতীত চাহিদাকে সীমিত রাখা এবং মানবিক গুণ ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ সাধন করা। ভোগের ক্ষেত্রে ইসলামি বিধি-নিষেধ অগ্রাধিকারের মাপকাঠি হিসেবে পরিগণিত।

ইসলাম অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যসমূহের অভাব পূরণকে অগ্রাধিকার দেয়। এরপর সামর্থ্য থাকলে আরামদায়ক ও বিলাসজাত দ্রব্যসমূহের অভাবের দিকে নযর দেওয়া যেতে পারে। ইসলামে অপচয়-অপব্যয় নিষিদ্ধ এবং অপরকে শোষণ করে, বঞ্চিত রেখে একা ভোগ করাও নিষিদ্ধ। ইসলামে শুধু হালাল জিনিসই ভোগ করা যায়। হারাম জিনিসের ভোগ-ব্যবহার ইসলামে পরিত্যাজ্য। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوْا صَالِحًا الخ .

অর্থাৎ, 'তোমরা হালাল বস্তুসমূহ থেকে ভোগ কর এবং নেক আমল কর।' ঠিক এমনিভাবে স্পষ্ট আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা হারাম দ্রব্যসমূহ ভোগ করা থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। যেমন আল্লাহ বলেন, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيْرِ اَلْاٰيَةُ

সুতরাং উল্লিখিত আয়াতদ্বয় থেকে স্পষ্টই বুঝা যায়, আল্লাহ তায়ালা মানুষের ভোগের জন্য কিছু জিনিস বৈধ করেছেন আবার কিছু জিনিস নিষেধ করেছেন।

অর্জিত সম্পদের পুরো অংশই ব্যক্তি নিজে ভোগ করতে পারবে না; বরং এখান থেকে অপরকেও দান করতে হবে। তবে সবকিছু দান করে বৈরাগ্য সাধনও আল্লাহ তায়ালার পছন্দ নয়। ব্যক্তির অধিকার সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا . অর্থাৎ, দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রীতে তোমার যে অংশ আছে তা তুমি ভুলে যেও না। (কাসাস : ৭৭) এর সাথে সাথে সম্পদ ভোগ না করে অপচয়ের পথ অবলম্বন থেকে সতর্ক করা হয়েছে অত্যন্ত কঠোর ভাষায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْا اِخْوَانَ الشَّيَاطِيْنَ .

অর্থাৎ, ধন সম্পদের অপচয় করো না, যারা অপচয় করে তারা শয়তানের ভাই। (ইসরা : ২৬ - ২৭)

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ভোগ অর্থনীতির এক উল্লেখযোগ্য দিক। ভোগনীতির ক্ষেত্রে প্রচলিত অর্থনীতি ও ইসলামি অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। ন্যায়নীতি, পরিচ্ছন্নতা, উপকারিতা ও নৈতিকতা ইসলামি ভোগনীতির অনবদ্য বৈশিষ্ট্য।

■ প্রশ্ন : ১০ ॥ হালাল-হারাম বলতে কী বুঝ? মানব জীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও হারাম উপার্জনের অপকারিতা আলোচনা কর।
[What do you mean by Halal and Haram? Discuss the importance of earnings in Halalway and demerits of earnings in Haramway in human life.]

উত্তর।।ভূমিকা : হালাল ও হারাম শব্দ দু'টি অর্থের দিক দিয়ে বিপরীতার্থক। হালাল অর্থ বৈধ আর হারাম অর্থ হচ্ছে অবৈধ। ইসলামি অর্থনীতিতে শুধু হালাল দ্রব্য ক্রয়ে অর্থ ব্যয় করা যাবে। হারাম দ্রব্য সর্বাবস্থায় বর্জনীয়। ইসলামে হালাল উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করার জন্য জোরালো নির্দেশ রয়েছে। কেননা হালাল উপার্জন ব্যতীত ঈমানদার হওয়া যায় না। মহান আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. (سُوْرَةُ النِّسَاء : ٢٩)

অর্থাৎ, "ওহে তোমরা যারা ঈমান এনেছ! তোমরা নিজেদের মধ্যে একজন অপরজনের অর্থসম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ করো না।" (সূরা নিসা : ২৯)
হালাল উপার্জন ছাড়া দুনিয়া ও আখেরাতের সফলতা অর্জন করা যায় না। হারাম পন্থায় উপার্জিত সম্পদ দ্বারা গঠিত শরীর জাহান্নামের ইন্ধন হবে।

➲ হালাল

হালাল (حَلَالٌ) অর্থ বৈধ বা সিদ্ধ বা আইনানুগ বা অনুমোদিত বিষয়। পবিত্র, গ্রহণযোগ্য, যথার্থ বা সঙ্গত অর্থেও হালাল শব্দটির ব্যবহার হয়ে থাকে। ইসলামি শরিয়তের পরিভাষায়, যেসব বিষয় অবৈধ হওয়া কুরআন ও হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়নি তাকে হালাল বলে। আল্লাহ তায়ালা ও রাসূল (স) যেসব কাজ সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো নিষেধাজ্ঞা দেননি তাকে হালাল বা বৈধ বলে। হালাল যেমন কাজ হতে পারে তেমনি তা কথা বা বস্তুও হতে পারে। ব্যবসায়, চাকরি, শিক্ষকতা হলো হালাল কাজ, ন্যায় ও সত্য বলা হচ্ছে হালাল কথা আর হালাল বস্তু হলো গরু-ছাগলের গোশত, মাছ, চাল-ডাল প্রভৃতি।
ফকীহগণের মতে, হালাল হলো যে, বস্তুতে অন্যের হক বা অধিকার নেই এবং আল্লাহ তায়ালার অবাধ্যতাও নেই। হাদীসে হালাল খাদ্য গ্রহণের ব্যাপারে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে "যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন যাবৎ হালাল রিযিক ভক্ষণ করবে আল্লাহ পাক তার অন্তরকে আলোকোজ্জল করে দেবেন এবং তা থেকে হিকমত বা রহস্যজ্ঞানের উৎসধারা প্রবাহিত হবে"। ইসলামি অর্থনীতিতে ঐসব দ্রব্যকে হালাল বলা হয় যার নৈতিক ও আদর্শগত গুণাগুণ থাকে, যেগুলোর ভোগ উপকার ও কল্যাণ বয়ে আনে, বিনিময়যোগ্য ও উপকারী এবং মাসলাহ বিদ্যমান। আল-কুরআনে বর্ণিত আছে– "হে মানুষ! পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও পবিত্র, তা থেকে ভোগ কর।" (সূরা বাকারা : ১৬৮)

➲ হারাম

হারাম (حَرَامٌ) অর্থ অবৈধ, নিষিদ্ধ। এটি হালালের বিপরীতার্থক শব্দ। নিষিদ্ধ, অসিদ্ধ, আইন বিরুদ্ধ, অসঙ্গত, অপবিত্র প্রভৃতি অর্থেও শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যা করলে অপরাধী সাব্যস্ত হয়, যা করার উপর সতর্কবাণী এসেছে, যা করলে তিরস্কারের উপযুক্ত হতে হয় তাই হারাম। শরিয়তের দৃষ্টিতে হারাম হলো, যা না করার বিষয়ে শরীয়ত সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করেছে এবং করলে আল্লাহর অবাধ্য ও শাস্তির যোগ্য সাব্যস্ত করেছে। ফকীহগণের মতে, যা থেকে বিরত থাকার নির্দেশ পবিত্র কুরআন, হাদীস, ইজমা দ্বারা প্রমাণিত তাই হারামের অন্তর্ভুক্ত। আল কুরআনে বর্ণিত আছে– "রক্ত, মৃত পশুর মাংস, শুকর এবং আল্লাহর নাম ব্যতীত বধকৃত পশুর মাংস হারাম" (সূরা আল-মায়িদাহ : ৩)। এগুলো মানুষের শরীর ও আত্মার পক্ষে ক্ষতিকর। তাই এগুলোকে হারাম করা হয়েছে। আবার যেসব বস্তুতে অপবিত্রতা ও অনিষ্টতা রয়েছে তা হারাম, যাতে কিছু উপকার আছে তবে ক্ষতি ও অনিষ্ট উপকারের তুলনায় বেশি তাও হারাম। এমনসব বস্তুও হারাম যা নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটায়। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে– "মদ্যপান শত্রুতা ও অসন্তোষের জন্ম দেয় এবং যারা মদ্যপানে আসক্ত হয়, তারা আল্লাহর ইবাদত থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহকে ভুলে যায়" (সূরা আল-মায়িদাহ : ১৯)। ইসলামি চিন্তাবিদগণের মতে, হারাম বস্তুর ব্যবহারে মানুষের পাঁচটি জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়– দেহ, বংশ, বিবেক-বুদ্ধি, সম্পদ ও চরিত্র।

➲ মানবজীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব

মানবজীবনে হালাল উপার্জনের গুরুত্ব ও উপকারিতা নিম্নে তুলে ধরা হলো :

১. **আল্লাহর নির্দেশ পালন :** আল্লাহ তায়ালা মানুষকে হালাল জীবিকা গ্রহণের নির্দেশ দিয়ে বলেছেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ.

অর্থাৎ, "হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে আমি যে পবিত্র জীবিকা দিয়েছি, তা থেকে খাও আর যদি তোমরা কেবল আল্লাহর ইবাদতই করতে চাও তবে তাঁর শোকর কর।" (সূরা বাকারা : ১৭২)
হালাল খাদ্য-পানীয় গ্রহণের জন্য প্রথমে হালাল উপার্জন প্রয়োজন। কাজেই হালাল উপার্জনে আল্লাহর নির্দেশ প্রতিপালিত হয়।

২. **কর্মপ্রেরণা জোগায় :** শ্রম ও সময় দিয়ে হালাল উপার্জন করার মাধ্যমে মানুষ কর্মপ্রেরণা লাভ করে। কেননা, উপার্জন হালাল রাখার জন্য ব্যক্তিকে কাজ করতে হয় এবং শ্রম ও সময় দিতে হয়। কায়িক বা বুদ্ধিবৃত্তিক শ্রম দিতে হয়। রাসূলুল্লাহ (স) প্রত্যেক মুসলিমকে তাই ঘুমোতে যাবার আগে নিজের ও নিজের পরিবারের জন্যে হালাল জীবিকা নিশ্চিত করতে বলেছেন–

اِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ فَلَا تَنَامُوْا عَنْ طَلَبِ رِزْقِكُمْ.

অর্থাৎ, "যখন তোমরা ফজরের সালাত শেষ করবে, তখন তোমরা জীবিকার অনুসন্ধান না করে ঘুমোতে যাবে না।"

৩. **সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত :** আনুষ্ঠানিক অন্যান্য ফরয ইবাদত যেমন সালাত, সাওম, যাকাত, হজ প্রভৃতির চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ফরয ইবাদত হলো হালাল উপার্জন। কেবল ঈমান গ্রহণের বিষয়টি এর চেয়ে অধিক গুরুত্ব পেতে পারে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন– طَلَبُ كَسْبِ الْحَلَالِ فَرِيْضَةٌ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ.

অর্থাৎ, "হালাল জীবিকা উপার্জন করা ফরযের চেয়েও একটি ফরয।"

৪. **আত্মিক প্রশান্তি লাভ :** হারাম উপার্জন সবসময় মানুষকে অস্বস্তি ও অরাজকতার মধ্যে রাখে। বিভিন্ন ভয় তাকে তাড়া করে। সবসময় তার অবৈধ নীতি বা কাজ মানুষের সামনে প্রকাশ হওয়ার ভয়ে সে ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। তার জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। হালাল উপার্জনে এরকম ভয়, দ্বিধা ও অশান্তি থাকে না। মানুষ নির্দ্বিধায় তার উপার্জন ভোগ করে। প্রশান্তিতে তার হৃদয়-মন পূর্ণ থাকে।

৫. **ইবাদত কবুল হওয়ার শর্ত :** মানুষ যদি হালাল উপার্জন এবং হালাল জীবিকা নির্বাহ করে তাহলে তার ইবাদত কবুল হবে। আর যদি সে হারাম উপার্জন করে, হারাম জীবিকা নির্বাহ করে– তার ইবাদত কবুল হবে না। হাদিসে সুস্পষ্ট ভাষায় বিষয়টির ব্যাখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে, "কোনো ব্যক্তি যদি দশ দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় কিনে আর এ দশ দিরহামের একটি দিরহাম হয় হারাম উপার্জনের– তাহলে যতদিন তার পরিধানে এ কাপড়টি থাকবে– সে ব্যক্তির নামাজ কবুল হবে না।" (মুসনাদে আহমদ ও বায়হাকি)

৬. **সর্বোত্তম খাদ্য গ্রহণের সুযোগ :** হালাল উপার্জনে কায়িক ও মানসিক শ্রম ব্যয় হয়। ইসলামে শ্রমলব্ধ হালাল উপার্জনকেই সর্বোত্তম উপার্জন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

مَا اَكَلَ اَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ اَنْ يَاْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

অর্থাৎ, দু'হাত দিয়ে উপার্জিত খাবারের চেয়ে উত্তম খাবার কেউ কোনো দিন খায়নি। (সহীহ বুখারি)

৭. **কর্মসংস্থান ও জাতীয় উন্নয়ন :** হালাল উপার্জনের বাধ্যবাধকতা লোকদেরকে চাকরির পাশাপাশি ব্যবসায়-বাণিজ্য, পশুপালন, হাঁস-মুরগির খামার প্রতিষ্ঠা, মাছ চাষ, বিভিন্ন ধরনের নার্সারি, গাছ লাগানো, কুটিরশিল্প প্রভৃতি উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠার প্রেরণা দেয়। এর ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পায়। জাতীয় উন্নয়ন ও সমৃদ্ধি অর্জিত হয়।

৮. **মর্যাদা লাভ :** হালাল উপার্জন ব্যক্তির মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করে। আল্লাহ তায়ালাও তাকে দুনিয়া ও আখেরাতে বিশেষ শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন– مَنْ سَعٰى عَلٰى عِيَالِهٖ مِنْ حِلِّهٖ هُوَ كَالْمُجَاهِدِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন দিয়ে তার পরিবার নির্বাহের চেষ্টা করে, সে যেন আল্লাহর পথের মুজাহিদ।" (মিশকাত)

৯. **আল্লাহর বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা লাভ :** হালাল উপার্জনে আল্লাহর নির্দেশ পালন করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আদর্শের অনুসরণ করা হয়। আর যারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলে আল্লাহ তাদের ভালোবাসেন। রাসূলুল্লাহ (স) এজন্যই বলেন– اَلْكَاسِبُ حَبِيْبُ اللّٰهِ অর্থাৎ, "হালাল উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু।"

১০. **ক্ষমা লাভ :** হালাল উপার্জন কেবল এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতই নয় যার মাধ্যমে শুধু পূণ্য ও মর্যাদাই লাভ করা যায়; বরং এটি এমন ইবাদত যা পূর্বেকৃত বিভিন্ন গুনাহ থেকে ক্ষমা লাভের কারণ হয়। রাসূল (স) বলেন, "কাজ করতে গিয়ে যে ব্যক্তি ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সে ব্যক্তির গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়।" (মিশকাত)

১১. **পরকালে সাফল্য লাভ :** মানুষ যদি হালাল উপার্জন করে সে পুণ্য পায়। এমনকি এর মাধ্যমে সে ইবাদত কবুল এবং গুনাহ মাফের সুযোগ লাভ করে– যার অনিবার্য পরিণাম হলো আখিরাতে সাফল্য লাভ। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন–

اَلتَّاجِرُ الْاَمِيْنَ الصَّدُوْقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

অর্থাৎ, "বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহিদদের সাথে থাকবে।"

➲ মানবজীবনে হারাম উপার্জনের অপকারিতা

১. **ইবাদত প্রত্যাখ্যান :** হারাম উপার্জনের প্রথম ও প্রধান কুফল হচ্ছে হারাম উপার্জনকারীর ইবাদত আল্লাহ তায়ালা কবুল করেন না। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মানুষ দীর্ঘপথ অতিক্রম করে (কাবায় আসে) এবং (দোয়া কবুলের আশায়) অবিন্যস্ত চুলে ধূলি ধুসরিত অবস্থায় আকাশের দিকে দু'হাত তুলে বারবার বলতে থাকে, হে আমার প্রতিপালক! হে আমার রব! অথচ তার খাবার হারাম, তার পানীয় হারাম, হারাম তার পোশাক এমনকি সে লালিতপালিত হয়েছে হারামভাবে! এমন ব্যক্তির দোয়া কীভাবে কবুল হবে?" (সহীহ মুসলিম)

২. **জাহান্নামী :** হারাম উপার্জনকারীর স্থায়ী আবাস জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন–

لَايَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ اَوْلٰى بِهٖ.

অর্থাৎ, "যে গোশত হারাম জীবিকা দ্বারা গঠিত তা জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর হারাম জীবিকায় গঠিত প্রতিটি গোশতের জন্যে উপযুক্ত আবাস হলো জাহান্নাম।"

৩. **সার্বিক ক্ষতি :** হারাম উপার্জনের ক্ষতির কোনো সীমা-পরিসীমা নেই। হারাম উপার্জন ও ভক্ষণ ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্য সর্বনাশ ডেকে আনে। এর ফলে সামাজিক শৃঙ্খলা ও অর্থনৈতিক উন্নতি ব্যাহত হয়। মানুষের পারস্পরিক আস্থা নষ্ট হয়। মানুষের কাছে অপমানিত হতে হয়। এমনকি পরকালেও অপমানিত ও লাঞ্ছিত হতে হবে।

৪. **মানসিক অশান্তি :** হারাম উপার্জনকারী মানসিক দুঃশ্চিন্তা ও অস্থিরতায় ভোগে। হারাম উপার্জন অন্যায় পথে হওয়ার কারণে তা নিয়ে ব্যক্তির দুঃশ্চিন্তা থাকে। তার মনে সর্বদা উৎকণ্ঠা, অস্থিরতা ও ভয় বিরাজমান থাকে।

৫. **অপচয় ও অপব্যয় বৃদ্ধি :** হারামভাবে উপার্জিত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার হয় না। হারাম উপার্জনকারী নির্দ্বিধায় অপচয় ও অপব্যয়ের নিষিদ্ধ প্রতিযোগিতায় লেগে থাকে।

৬. **কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ :** আল্লাহ তায়ালা হারাম উপার্জন করতে নিষেধ করেছেন। হারাম উপার্জনে একদিকে যেমন আল্লাহর নির্দেশের বিরোধিতা করা হয় অন্যদিকে নিজের কুপ্রবৃত্তিরও অনুসরণ করা হয়। কুপ্রবৃত্তি তাকে সর্বদা হারাম উপার্জনে প্ররোচিত করে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يٰاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ـ

অর্থাৎ, "হে মানুষ! পৃথিবীতে যা আছে তা থেকে হালাল ও পবিত্র বস্তু খাও এবং শয়তানের পথ অনুসরণ করো না। নিশ্চয় শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা : ১৬৮)

৭. **সমাজ জীবনের জন্য অভিশাপ :** চুরি-ডাকাতি-ছিনতাই, রাহাজানি বা অন্যের অধিকার হরণ প্রভৃতির সাথে জড়িয়ে থাকে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের অভিশম্পাত। আল্লাহ তায়ালা ও রাসূলুল্লাহ (স) অভিশাপ দিয়েছেন ঘুষদাতা, গ্রহীতা ও তার সাক্ষীদের। এমনকি ফেরেশতারা পর্যন্ত প্রতারক ব্যবসায়ীদের জন্যে আল্লাহর লানত কামনা করে। পৃথিবীর কোনো বিবেকবান মানুষই হারাম উপার্জনকারীকে ভালবাসে না। সুতরাং পৃথিবী ও পরকালে সাফল্য লাভের পথে হারাম উপার্জন অন্তরায় হবে।

৮. **প্রতারণামূলক উপার্জন :** অন্যায় ও অবৈধভাবে কিছু হাসিল করার জন্য কাউকে অবৈধভাবে কিছু দেওয়াকে ঘুষ বা উৎকোচ বলে। ঘুষ হচ্ছে অবৈধ, প্রতারণামূলক উপার্জন। তাই ইসলামে ঘুষ হারাম। মহানবী (স) বলেন–

اَلرَّاشِىْ وَالْمُرْتَشِىْ كِلَاهُمَا فِى النَّارِ ـ

অর্থাৎ, "ঘুষদাতা ও ঘুষগ্রহীতা উভয়ই জাহান্নামী।"

আরেক হাদিসে আছে, لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ وَالرَّائِشَ يَعْنِى الَّذِىْ يَمْشِىْ بَيْنَهُمَا

অর্থাৎ, "রাসূল (স) ঘুষদাতা, গ্রহীতা এবং এর লেনদেনের দালালদের প্রতি অভিশাপ দিয়েছেন।" (আবি শাইবা : হাদীস নং-২১০০)

৯. **শয়তানের দোসর :** হারাম উপার্জনকারী শয়তানের দোসর। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ (سُوْرَةُ الْبَقَرَة : ١٦٨)

অর্থাৎ, "হে মানব সম্প্রদায়, দুনিয়ায় যা কিছু আছে, তা থেকে হালাল পবিত্র বস্তু গ্রহণ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে না। সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৮)

১০. **কেয়ামতের দিন মুনাফিক ও ফাসিক অবস্থায় উঠবে :** রাসূল (স) বলেন, "কেয়ামতের দিন মুত্তাকী, সত্যবাদী এবং নেককার ব্যবসায়ী ছাড়া অন্যসব ব্যবসায়ী ফাসিক হয়ে উঠবে।"

১১. **নীতিবর্জিত ও মারাত্মক অত্যাচার :** ব্যবসায়-বাণিজ্য হালাল, কিন্তু সুদ হারাম। কারণ, এটি ন্যায়নীতি বর্জিত, নিপীড়নমূলক উপার্জন। আল্লাহ বলেন– وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰا - (سُوْرَةُ الْبَقَرَة : ٢٧٥)

অর্থাৎ, "আল্লাহ ক্রয়-বিক্রয় হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন।" (সূরা বাকারা : আয়াত-২৭৫)

১২. **ইবাদত কবুল হয় না :** হারাম উপার্জনের মাধ্যমে জীবিকানির্বাহ করলে তার ইবাদত কবুল হয় না। ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য হালাল জীবিকা পূর্বশর্ত।

১৩. **পরিণাম জাহান্নাম :** মহানবী (স) বলেছেন– كُلُّ جَسَدٍ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ اَوْلٰى بِهٖ

অর্থাৎ, "হারাম খাদ্যে পরিপুষ্ট দেহ, জাহান্নামের আগুন তার জন্য উপযুক্ত স্থান।" (বায়হাকি, শুআবুল ঈমান : হাদীস নং-৫৩৭৫)

উপসংহার : পরিশেষ বলা যায়, মিথ্যা না বলে, প্রতারণা না করে, অপরকে ক্ষতিগ্রস্ত না করে, কোনো অবৈধ বা অন্যায় পথ অবলম্বন ব্যতীত যে-কোনো উপার্জনই হালাল উপার্জন। যেমন ব্যবসায়, শিক্ষকতা, চাকরি কিংবা অন্য যে-কোনো হালাল পেশা। কোনো ব্যবসায় যদি জনস্বার্থ ও জনস্বাস্থ্যের হুমকি হয়– তা হালাল হবে না। শিক্ষকতা, চাকরি বা অন্য পেশাতেও যদি অর্পিত দায়িত্ব ঠিকমতো পালন করা না হয় তাহলে তাও হালাল হবে না। কাজেই হালাল উপার্জনের উপায় নির্ধারণের ক্ষেত্রে মূলনীতি হলো– যে কাজ করা হবে তা হালাল হতে হবে এবং যেভাবে করা হবে তাও হালাল হতে হবে। হারাম পথে উপার্জনকারী আত্মদহনে ভুগতে থাকে। তাই সে শারীরিক ও মানসিক শান্তি পায় না। সে দুনিয়া ও আখেরাতে ব্যর্থ। সুতরাং সবার উচিত হারাম উপার্জন থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা।

■ প্রশ্ন : ১১ ॥ ইসলামি ব্যাংক কী? ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা কর।

[What is Islamic Bank? Discuss the functions of Islamic Bank.]

উত্তর।। ভূমিকা : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামি শরীয়তের নীতিমালার অনুসরণে এটি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কুরআন ও হাদীসের আইনের অনুসরণে এর যাবতীয় কার্যক্রম ও লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (স)-এর অনুমোদিত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এটি ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা প্রদান করে।

➲ ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা

ইসলামি ব্যাংক এমনই এক ব্যবস্থা নির্দেশ করে, যেখানে ব্যাংকিং এর যাবতীয় কার্যাবলি ইসলামি মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয় এবং সমাজের তথা সারা দেশের জনগণের জন্য সুবিচার বা ইনসাফের পরিবেশ সৃষ্টির অনুপ্রেরণার উন্মেষ ঘটে। এটি এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামি সমাজের আর্থসামাজিক উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য শরীয়তের নীতিমালা অনুসরণ করে কারবার পরিচালনা করে এবং এর সকল কার্যক্রম সুদমুক্ত।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

ইসলামি ব্যাংকের কতিপয় প্রামাণ্য সংজ্ঞা নিম্নে উপস্থাপিত হলো :

১. মুসলিম দেশসমূহের সংস্থার **(ওআইসি)** সচিবালয় ইসলামি ব্যাংকের একটি সুনির্দিষ্ট ও সহজবোধ্য সংজ্ঞা প্রদান করে। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসে সেনেগালের রাজধানী ডাকারে অনুষ্ঠিত ওআইসির সদস্য দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলনে এ সংজ্ঞা সর্বসম্মতভাবে অনুমোদন করা হয়। ওআইসি জেনারেল সেক্রেটারিয়েট এটি প্রকাশ করে। সংজ্ঞাটি হচ্ছে–
"ইসলামি ব্যাংক এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা তার বিধিবিধান, নিয়মাবলি এবং কর্মপদ্ধতির সব স্তরে ইসলামি শরীয়ার নীতিমালার প্রতি সুস্পষ্ট আনুগত্য প্রকাশ করে এবং তার সকল প্রকার কার্যক্রমে সুদের লেনদেন বর্জন করে।" (Islamic Bank is a financial institution whose status, rules and procedures expressly state its commitment to the principles of Islamic Shariah and to the banning of the receipt and payment of interest on any of its operations.)

২. ১৯৮২ সালে মালয়েশিয়ার ফেডারেল পার্লামেন্টে ইসলামি ব্যাংকিং আইন পাস হয়। ১৯৮৩ সালে এটি সরকারি গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এতে ইসলামি ব্যাংকের যে সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে তা নিম্নরূপ :
"ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে এমন একটি কোম্পানি, যা ইসলামি ব্যাংকিং কারবারে/ব্যবসায় নিয়োজিত এবং যার একটি বৈধ লাইসেন্স আছে। আর ইসলামি ব্যাংকিং কারবার/ব্যবসায় হচ্ছে এমন এক ব্যবসায়, যার লক্ষ্য এবং কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন কোনো উপাদান নেই, যা ইসলাম অনুমোদন করে না।" (Islamic Banking means any company which carries on Islamic Banking business and holds a valid licence. Islamic Banking business means banking business whose aims and operations do not involve any element which is not approved by the Religion of Islam.)

৩. **ইন্টারন্যাশনাল এসোসিয়েশন অভ ইসলামি ব্যাংকস** ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা দানে বলেছে, "ইসলামি ব্যাংক কার্যত একটি নতুন ব্যাংকিং ধারণা, যা আর্থিক এবং সকল কার্যক্রমে ইসলামি শরীয়ার নীতিমালা সুষ্ঠুভাবে মেনে চলে। অধিকন্তু ব্যাংক যখন শরীয়ার নীতিমালার আলোকে পরিচালিত হবে, তখন বাস্তবজীবনে ইসলামি নীতিমালার প্রয়োগ প্রতিফলিত হবে। ইসলামি সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়েই ইসলামি ব্যাংক কাজ করবে এবং এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য জনগণের মধ্যে ইসলামি চেতনার বিকাশ সাধনে এ ব্যাংক নিরন্তর কর্মরত থাকবে।" (The Islamic Bank basically implements a new banking concept in that it adheres strictly to the rulings of Islamic Shariah in the fields of finance and other dealings. Moreover, the bank when functioning in this way must reflect Islamic principles in real life. The Bank should work towards the establishment of an Islamic society; hence, one of its primary goals is the deeping of religious spirit among the people.)

৪. প্রখ্যাত পাকিস্তানি ব্যাংকার ও অর্থনীতিবিদ **ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ** বলেন, "সুদমুক্ত ব্যাংকিং একটি সুনির্ধারিত ধারণা, এটি এমন একটি ব্যাংকব্যবস্থা, যা সুদ নিষিদ্ধকরণে নিয়োজিত। ইসলামি ব্যাংকিং অবশ্য নিয়মনীতি সমৃদ্ধ একটি ধারণা, যেটিকে ব্যাংকব্যবস্থার এমন নিয়মনীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে, যা ইসলামি সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের সাথে সংহতিপূর্ণ।"
(Interest free banking is a mechanical concept, devoting a banking which stresses banning of interest. Islamic banking essentially a normative concept and could be defined as conduct of banking in consonance with the ethos of the value system of Islam.)

৫. ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞায় প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ প্রফেসর **ড. এম.এ. হামিদ** বলেন, "ইসলামি ব্যাংক হলো এমন এক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামি সমাজের আর্থসামাজিক লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে ইসলামি শরীয়ার নীতি অনুসারে বিশেষভাবে রিবাকে পরিহার করে তার সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।" (Islamic Bank is a multi form financial institution which conducts its activities according to the principles of Islamic Shariah, banning of Riba in particular, in all its operations and help to achieve the socio-economic goals of an Islamic society.)

৬. ইসলামি ব্যাংকের একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা প্রদান করেছেন মিশরের আইন শামস বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থাপনা বিভাগের অধ্যাপক **ড. সাইয়েদ আল হাওয়ারী**। তিনি বলেন, "যে ব্যাংক ইসলামি আদর্শের ওপর ভিত্তি করে এবং এ থেকে তার সকল বুনিয়াদী নীতিমালা গ্রহণ করে এমন ব্যাংককেই ইসলামি ব্যাংক বলে। এ ব্যাংক ইসলামি রীতিনীতিতে বিশ্বাস করে এবং সকল কার্যক্রমে এ বিশ্বাসের প্রতিফলন ঘটায়।"

৭. বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক ডেপুটি গভর্নর এবং প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ ও ব্যাংকার **এএসএম ফখরুল আহসান** ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞায় বলেন, "ইসলামি ব্যাংক হচ্ছে একটি আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, পরিচালনা পদ্ধতি, নীতিমালা ও কাজ অবশ্যই ইসলামি শরীয়ার মূলনীতি অনুসারে পরিচালিত হবে এবং এর কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে অবশ্যই সুদের ব্যবহার পরিহার করতে হবে।"

৮. **আবদুল মজিদ** ইসলামি ব্যাংকের সংজ্ঞা দানে বলেন, "ইসলামি ব্যাংক তার শেয়ারহোল্ডারদের মালিকানাধীন এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা এর সকল ব্যাংকিং এবং বিনিয়োগ কার্যক্রমে ইসলামি শরীয়ার নীতিমালা এবং (নিজস্ব) আর্টিকেলস অভ এসোসিয়েশন অনুযায়ী পরিচালিত হয়।" (Islamic Bank as owned by its shareholders, established to conduct banking and investment activities in accordance with the Islamic Shariah and its (own) articles of association).

৯. **ড. মোহাম্মদ হায়দার আলী মিয়ার** মতে, "ইসলামি ব্যাংক এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা ইসলামি শরীয়ার নীতিমালার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় এবং লেনদেনের কোনো অবস্থাতেই সুদ গ্রহণ ও প্রদান করে না।" (Islami Bank is a financial institution which will not receive or pay interest in any of its form and its all activities will be in accordance with the principles of Islamic Shariah.)

➲ ইসলামি ব্যাংকের কার্যাবলি

নিচে একটি ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. **আমানত গ্রহণ :** জনগণের কাছ থেকে অর্থ বা আমানত সংগ্রহ করা এবং এর লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলির অংশ। সুদমুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হবার কারণে এর আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের আমানত হিসাবসমূহ নিম্নরূপ :

ক. আল-ওয়াদিয়া চলতি জমার হিসাব
খ. মুদারাবা সঞ্চয়ী জমা হিসাব বা লাভ লোকসান অংশীদারি জমার হিসাব
গ. মুদারাবা মেয়াদী জমার হিসাব বা লাভ-লোকসান অংশীদারি মেয়াদী হিসাব
ঘ. মুদারাবা নোটিশ জমার হিসাব বা লাভ-লোকসান অংশীদারি বিশেষ নোটিশ হিসাব
ঙ. হজ্ব সঞ্চয় হিসাব

২. **বিভিন্ন আমানতী হিসাব এর বর্ণনা :**

ক. আল-ওয়াদিয়া/চলতি জমার হিসাব : আল-ওয়াদিয়া আরবি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস। এ হিসাবে যে আমানত সংগৃহীত হয় তা যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা এবং চাহিবামাত্র ফিরিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়। সাথে সাথে এ টাকা যে-কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করার অনুমতিও নেওয়া হয়।

খ. মুদারাবা সঞ্চয়ী জমার হিসাব : ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে নির্ধারিত ফরম পূরণ করে যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই হিসাব খুলতে পারে। প্রতি মাসে কতবার এবং কী পরিমাণ টাকা উত্তোলন করা যাবে তা পূর্বেই নির্ধারিত থাকে। এই হিসাবে রক্ষিত টাকা ব্যাংক নিজ দায়িত্বে বিনিয়োগের অধিকার রাখে। আমানতকারীগণ এই বিনিয়োগের লাভ-ক্ষতির অংশীদার হন। বার্ষিক লাভ-ক্ষতি হিসাব চূড়ান্ত হওয়ার পর আমানতকারীগণকে তার অংশ প্রদান করা হয়।

গ. মুদারাবা মেয়াদী জমার হিসাব : এই হিসাবে আমানতকারীর যখন তখন লেনদেন করার সুযোগ থাকে না। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য জমা করতে হয়। মেয়াদ পূর্তির পর একবারে সমস্ত টাকা তুলে নিতে হয়। মুদারাবা মেয়াদী জমার হিসাবকে এর প্রকৃতির দিক থেকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।

(i) অনুমোদনপ্রাপ্ত মুদারাবা মেয়াদী জমা : এক্ষেত্রে আমানতকৃত টাকা ব্যাংক তার ইচ্ছেমতো যে-কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগ করতে পারে। আমানতকারী সুনির্দিষ্ট প্রকল্পে বিনিয়োগের পরিবর্তে যে-কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের অধিকার ব্যাংককে প্রদান করে। এরূপ আমানতকারী ব্যাংক এর সার্বিক কর্মকাণ্ডের ওপর যে নিট ফল দাঁড়ায় তারই অংশ পায়।

(ii) অনুমোদনবিহীন মুদারাবা মেয়াদী জমা : এই আমানতে আমানতকারী ব্যাংকের ইচ্ছেমতো প্রকল্পে বিনিয়োগের অনুমতি দেয় না। ব্যাংকের বহুবিধ লাভজনক বিনিয়োগ প্রকল্পের মধ্য হতে আমানতকারী তার নিজের ইচ্ছেমতো প্রকল্পে বিনিয়োগ করে। আমানতকারী সংশ্লিষ্ট প্রকল্পেরই লাভ-লোকসানের অংশীদার হয়। ব্যাংকের নিট লাভ-লোকসানের সাথে এ হিসাবের কোনো সম্পর্ক থাকে না।

ঘ. মুদারাবা নোটিশ জমার হিসাব : ন্যূনতম পরিমাণ অর্থ জমা দিয়ে যে-কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এই হিসাব খুলতে পারেন। আমানতকারী যে-কোনো পরিমাণ অর্থ যে-কোনো সময় জমা করতে পারেন; কিন্তু টাকা উত্তোলনের জন্য আগাম নোটিশ দিতে হয়। এই হিসাবে আমানতকারী ব্যাংকের নিট লাভ-লোকসানের অংশীদার হন।

ঙ. হজ্ব সঞ্চয় হিসাব : এটি একটি বিশেষ সঞ্চয়ী হিসাব। হজ্ব পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ যাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের মাধ্যমে হজ্ব পালন করতে পারেন সেজন্য ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক এ হিসাবের ব্যবস্থা করেছে। নির্দিষ্ট সময়ান্তে হজ্ব পালনে ইচ্ছুক ব্যক্তি কত বছর পরে হজ্ব সম্পাদন করতে চান তার ভিত্তিতে মাসিক কিস্তিতে হজ্ব সঞ্চয় হিসাবে টাকা জমা রাখা হয়।

৩. সঞ্চয় সমাবেশকরণ : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সঞ্চয় সমাবেশ করা। কেননা সামাজিক কল্যাণে সঞ্চয় সমাবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত আমানত অর্থ ব্যাংক নিম্নলিখিত পন্থায় ব্যবহার করে থাকে।

ক. নগদ : ব্যাংক মোট আমানতী দায়ের শতকরা ১০ ভাগ নগদ হিসেবে রাখতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংক কী পরিমাণ অর্থ নগদরূপে রাখবে তা জনগণের ব্যাংকিং অভ্যাস, দেশে নগদ অর্থের ব্যবহার এবং সংগ্রহ প্রক্রিয়ায় চেক ভাঙ্গানোর জন্য প্রয়োজনীয় সময়ের দ্বারাই নির্ধারিত হবে।

খ. বিধিবদ্ধ জামানত : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংককে এর তলবী আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় বিধিবদ্ধ জামানত হিসেবে জমা রাখতে হবে। দেশে মুদ্রানীতির দাবি অনুসারে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এই বিধিবদ্ধ জামানতের হার হ্রাস-বৃদ্ধি করতে পারবে।

গ. সরকার : সরকারের যেসব সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে মুনাফার অংশীদারিত্ব নীতি বাস্তবায়ন করা যায় না, সেসব প্রকল্পে অর্থ সরবরাহে সরকারকে সক্ষম করে তোলার জন্য ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের তলবী আমানতের একটি বিশেষ অংশ (সর্বোচ্চ ২৫%) সরকারকে প্রদান করা যায়। এই অর্থ হবে মুদ্রা সরবরাহে কোনো নির্দিষ্ট বাঞ্ছিত প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের আর্থিক ভিত্তি সম্প্রসারিত করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত অর্থের অতিরিক্ত। এভাবে সরকারকে প্রদত্ত তহবিল ঐসব প্রকল্পে অর্থ সরবরাহ সম্ভব করে তুলবে, যেগুলোর ব্যাপক সামাজিক কল্যাণ থাকা সত্ত্বেও প্রত্যক্ষ আর্থিক আয় খুবই নগণ্য বা একেবারেই নেই এবং এ কারণে এতে মুনাফার অংশীদারিত্ব নীতি কার্যকর করা সম্ভব নয়। সরকার এভাবে প্রাপ্ত তহবিল কেবল ব্যাপক সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পে বিনিয়োগ করবে এবং দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সম্পদ ও আয়ের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা ইত্যাদি উদ্দেশ্য অর্জনে ব্যবহার করবে।

৪. ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ : উপরিউক্ত লেনদেন শেষে তলবী আমানতের প্রায় শতকরা ৪৫ হতে ৬০ শতাংশ এবং মুদারাবা আমানতের সম্পূর্ণ অংশ বাণিজ্যিক ব্যাংকের নিকট থেকে যাবে। বাণিজ্যিক ব্যাংক সরাসরিভাবে অথবা ব্যাংক বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এ অর্থ বিনিয়োগ করবে।

সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ বলতে অর্থলগ্নীকে বুঝায়। ব্যবহারিক দিক থেকে সুদভিত্তিক ব্যাংক এবং ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে বিনিয়োগ শব্দটির পার্থক্য অনেক। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ শেয়ার, সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার, বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদিতে যে অর্থলগ্নী করে তাকে বিনিয়োগ বলা হয়; কিন্তু ইসলামি ব্যাংক উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) ছাড়া অন্য সব ধরনের ব্যাবসায়িক লেনদেনকে বিনিয়োগ নামে অভিহিত করে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ তাদের সব ধরনের অর্থলগ্নী সুদের ভিত্তিতে করে; কিন্তু ইসলামি ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রম লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করে। অন্যান্য ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রমে হালাল-হারামের পার্থক্য করে না; কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক সম্পন্ন হয়, যা একটি শরীয়া বোর্ড তদারক করে।

যেসব ব্যবসায়-বাণিজ্য সুদের দ্বারা পরিচালিত হয়, ইসলামি ব্যাংক তাতে অংশগ্রহণ করে না। লটারি, ফটকা কারবারী, জুয়া প্রভৃতি দূষণীয় কাজে জাতীয় অর্থের এক বিরাট অংশ অপচয় হয়। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ নিজেদের মুনাফার জন্য ফটকা ব্যবসায়েও অর্থলগ্নী করে বা এ ধরনের ব্যবসায় পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সাহায্য করে। ইসলামি ব্যাংক এ জাতীয় কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনোরূপ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে না।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো বিশেষ গ্রুপ বা বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয় বরং সমগ্র উম্মাহ (জাতি)-র জন্য কাজ করে। এ ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের সুযোগ-সুবিধা সমগ্র জাতির মধ্যে বণ্টন করে। ব্যক্তি বিশেষ বা গ্রুপ বিশেষকে একচেটিয়া সুযোগ সুবিধা প্রদান না করা ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

খ বিভাগ– সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

মান– ৫ × ৪ = ২০

■ প্রশ্ন : ১২ ॥ ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের মূলনীতিগুলো লেখ।

[Write the principles of distribution of wealth in Islamic economics.]

উত্তর।। ভূমিকা : একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জনগণের কল্যাণ সর্বাধিকরণের লক্ষ্যে সম্পদ বণ্টন গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক বিষয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সহযোগিতাও প্রয়োজন হয়। ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ বন্টনের বিষয়টি আরও তীক্ষ্ম ও নিবিড়ভাবে চিন্তা করে কাজ করতে হয়। ইসলামি অর্থব্যবস্থায় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়। যার দরুণ সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব। অর্থ উপার্জন, ব্যবসায়, ভোগ, সঞ্চয় ইত্যাদি উপাদানও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র কুরআন ও হাদীস নির্দেশিত পন্থায় সম্পদ উপার্জন ও ভোগ করবে। ফলশ্রুতিতে সমাজে আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রিত হবে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে।

➲ ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের মূলনীতি

ইসলামি সমাজে আয় ও সম্পদের বণ্টন কীভাবে হবে তা কুরআন ও হাদীসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইসলামে ইচ্ছামতো আয়ের যেমন সুযোগ নেই তেমনি ইচ্ছামতো ভোগ ও ব্যয়েরও কোনো সুযোগ নেই। এসব দৃষ্টিভঙ্গির প্রেক্ষিতেই কুরআনে এরশাদ হয়েছে, "হে ঈমানদারগণ! একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না; কিন্তু ব্যবসায়-বাণিজ্য যদি পরস্পরের সম্মতিক্রমে হয় তবে আপত্তি নেই" (সূরা আল-নিসা : ২৯)। অনুরূপভাবে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, "যারা দাম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি চল্লিশ দিনের বেশি মজুত রাখে তাদের সাথে আমার (অর্থাৎ রাসূলের) কোনো সম্পর্ক নেই। রাসূল (স) আরো বলেন, "যারা অন্যকে ঠকায় ও অন্যের সাথে প্রতারণা করে তারা আমাদের (অর্থাৎ মুমিনদের) মধ্যে নেই।" উপরোক্ত মূলনীতিসমূহের আলোকে ইসলামি রাষ্ট্র আয় ও সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে নিম্নোক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করতে পারে।

১. **মৌলিক চাহিদা পূরণ :** ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদের বণ্টন এমনভাবে করা হয় যাতে রাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রতিটি নাগরিকের মৌলিক প্রয়োজন ন্যায্যতার ভিত্তিতে পূরণ করা সম্ভব হয়। অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষা এগুলো হচ্ছে মানুষের মৌলিক অধিকার। এ সমস্ত মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ফলে সামগ্রিক চাহিদা বাড়ে, উৎপাদন বাড়ে, যোগান বাড়ে, কর্মসংস্থান বাড়ে, আয় বাড়ে ফলে ভোগ বাড়ে। এভাবে একটি দরিদ্র চক্র থেকে পরিত্রাণ পেয়ে ইসলামি সমাজে উন্নয়ন চক্র সৃষ্টি হয়।

২. **যাকাত আদায় ও বণ্টন :** ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে যাকাত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যাকাতকে ধনীদের উপর ফরয করা হয়েছে। যাকাতের অর্থ গরিব, নিঃস্বদের মাঝে বণ্টনের ফলে সামাজিক বৈষম্য অনেকাংশে কমে যায়।

৩. **ওশর আদায় :** ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় উৎপাদিত কৃষিপণ্যের এক দশমাংশ গরিবদের মাঝে বণ্টন করার নীতিকে ওশর বলে। আল্লাহ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা স্বীয় উপার্জন থেকে এবং যা আমি তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি তা হতে উৎকৃষ্ট বস্তু ব্যয় কর।" ওশর আদায় করে গরিব চাষীদের মাঝে ব্যয় করলে সম্পদের সুষম বণ্টন হবে।

৪. **সুদ উচ্ছেদ :** সুদ সামাজিক বৈষম্য, বেকারত্ব বৃদ্ধি করে এবং পাশাপাশি মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি করে। ইসলামি অর্থনীতিবিদগণের মতো সুদের পরিবর্তে ব্যবসা বাণিজ্যের মাধ্যমে আয় উপার্জন করা হলে সম্পদের বণ্টন সুষম হতে বাধ্য।

৫. **উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন :** ইসলামি অর্থনীতিতে সম্পদ বণ্টনের অন্যতম উপায় উত্তরাধিকার আইন বাস্তবায়ন। এক্ষেত্রে একজন ব্যক্তির আয় ও সম্পদ তার মৃত্যুর পর তার ছেলে মেয়ে, স্ত্রী ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের মাঝে বণ্টিত হয়। এতে করে একদিকে যেমন তাদের তাৎক্ষণিক অসহায় অবস্থা দূর হয় তেমনি সম্পদ অন্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের হাতে কুক্ষিগত হওয়ার সুযোগ থাকে না।

৬. **বায়তুল মাল গঠন :** ইসলামি অর্থনীতিতে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বায়তুল মালও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গরিব, দুঃখী, নিঃস্ব লোকদের মাঝে বায়তুল মাল থেকে সম্পদ বণ্টনের প্রচেষ্টা নেওয়া হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে উপরোক্ত নীতিমালা বা পদ্ধতিগুলোর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে। সর্বোচ্চ আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করতে হয়। তাহলে ধন-বৈষম্য হ্রাস পাবে, আয় ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। ফলস্বরূপ সম্পদের সুষম বণ্টনের মাধ্যমে একটি সুখী, সমৃদ্ধিশীল ও গতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠা করে অর্থনৈতিক ভারসাম্যহীনতা দূর করা অনেকাংশে সম্ভব হবে।

■ প্রশ্ন : ১৩ ॥ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যাখ্যা কর।

[Explain the law of diminishing marginal utility.]

উত্তর।। ভূমিকা : যখন কোনো ব্যক্তি একই দ্রব্য ক্রমাগত ভোগ করতে থাকে তখন ঐ দ্রব্য থেকে প্রাপ্ত উপযোগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে। ফলে মোট উপযোগ ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়লেও প্রান্তিক উপযোগ কমে। এ অবস্থাকে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি বলা হয়।

➲ ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি

মানুষের অভাব অপরিসীম। কিন্তু একটি বিশেষ দ্রব্যের অভাব সসীম। কোনো ব্যক্তি যখন একই দ্রব্য ক্রমাগতভাবে ভোগ করতে থাকে তখন তার কাছে ঐ দ্রব্যের প্রান্তিক উপযোগ ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে। উপযোগের এ বিধিকে "ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি" বলা হয়। অধ্যাপক **মার্শাল** বলেন, "কোনো ব্যক্তি কোনো বিশেষ দ্রব্যের মজুত বৃদ্ধির ফলে যে অতিরিক্ত উপযোগ লাভ করে তা মজুত বৃদ্ধির সাথে সাথে ক্রমশ হ্রাস পেতে থাকে।" (The additional benefits which a person derives from a given increase of his stock of anything diminishes with the growth of the stock that he already has. –Prof. **Marshall**)। কোনো ভোক্তা যদি একটি দ্রব্য ক্রমশ অধিক পরিমাণে ভোগ করতে থাকে তখন ঐ দ্রব্যের অতিরিক্ত এককগুলো হতে সে ক্রমশ কম উপযোগ লাভ করে এবং এর জন্য ক্রমশ কম মূল্য দিতে প্রস্তুত থাকে। ভোক্তার এ প্রবণতাই অর্থনীতিতে ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি নামে পরিচিত।

ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি নিম্নে একটি সূচির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হলো :

দ্রব্যের পরিমাণ (কমলালেবু)	মোট উপযোগ (টাকা)	প্রান্তিক উপযোগ (টাকা)
১ম	৫	৫
২য়	৯	৪
৩য়	১২	৩
৪র্থ	১৪	২
৫ম	১৫	১
৬ষ্ঠ	১৫	০
৭ম	১৪	−১

উপরের সূচিতে দেখা যায়, ভোক্তা ১ম কমলালেবুর জন্য ৫ টাকা দিতে রাজি আছে। কারণ, সে তা হতে ৫ টাকার সমান উপযোগ পাচ্ছে। ১ম কমলালেবুটি পাওয়ার পর তার কমলালেবুর জন্য আকাঙ্ক্ষা কিছুটা হ্রাস পাবে এবং সে ২য় কমলালেবুর জন্য ৪ টাকা দিতে প্রস্তুত থাকে। কারণ ২য় কমলালেবু হতে সে ৪ টাকার সমান উপযোগ পাচ্ছে। ২য় কমলালেবুর পাওয়ার পর তার কমলালেবু খাওয়ার ইচ্ছা আরও কমে যায়। এ জন্য সে ৩য় ও ৪র্থ কমলালেবুর জন্য যথাক্রমে ৩ টাকা ও ২ টাকা দিতে রাজি থাকে। এভাবে ৫ম কমলালেবুর জন্য সে ১ টাকা দিতে রাজি আছে। কিন্তু ৫ম কমলালেবুটি খাওয়ার পর তার কমলালেবু খাওয়ার আর কোনো ইচ্ছা থাকে না। এ জন্য ৬ষ্ঠ কমলালেবু থেকে সে কোনো উপযোগ পায় না অর্থাৎ সেক্ষেত্রে প্রান্তিক উপযোগ শূন্য (০) হয়। এরপরও যদি ৭ম কমলালেবুটি ভোগ করে তাহলে প্রান্তিক উপযোগ "ঋণাত্মক"−১ হয়। এভাবে দেখা যায় ভোক্তা কোনো নির্দিষ্ট সময়ে একই দ্রব্য যত অধিক পরিমাণে ভোগ করে ততই প্রান্তিক উপযোগ হ্রাস পেতে থাকে এবং মোট উপযোগ বাড়লেও তা ক্রমহ্রাসমান হারে বাড়ে। এ বিধিটিই অর্থনীতিতে 'ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধি' নামে পরিচিত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ক্রমহ্রাসমান প্রান্তিক উপযোগ বিধিটি ব্যষ্টিক অর্থনীতির একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধি। ভোক্তার আচরণ ও দ্রব্যের দাম নির্ধারণে বিধিটি যথেষ্ট কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে।

■ প্রশ্ন : ১৪ ॥ অর্থের কার্যাবলি আলোচনা কর।

[Discuss the function of money.]

উত্তর।। ভূমিকা : মুদ্রা এমন একটি জিনিস, যার সহজ ও সর্বজনীন ব্যবহার, বিনিময় ও গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা এমন একটি বিনিময়ের মাধ্যম, যা সবার কাছে গ্রহণযোগ্য এবং যার দ্বারা সব রকম লেনদেন তথা দেনা-পাওনা, ক্রয়-বিক্রয় প্রভৃতির হিসাব নিকাশ সম্পন্ন করা হয়।

➲ অর্থের কার্যাবলি

আধুনিক অর্থনীতিবিদগণ মুদ্রার কার্যাবলিকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করেছেন; যথা– ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি, খ. সামাজিক কার্যাবলি ও গ. মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি।

ক. বাণিজ্যিক কার্যাবলি : অর্থের মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলোই হচ্ছে বাণিজ্যিক কাজ। অর্থের কার্যাবলি সম্পর্কে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ **ক্রাউথার** বলেন– "Money is a matter of functions four. A medium, a measure, a standard and a store." অর্থাৎ, "অর্থের কাজ হলো চার। মাধ্যম, পরিমাপক, মান ও ভান্ডার।" নিম্নে অর্থের প্রধান বাণিজ্যিক কার্যাবলি আলোচনা করা হলো :

১. **বিনিময়ের মাধ্যম :** অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ হচ্ছে বিনিময়ের মাধ্যম। অর্থ প্রচলনের পূর্বে সমাজে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এ প্রথার প্রধান অসুবিধা ছিল এই যে, ক্রেতা ও বিক্রেতার অভাবের মধ্যে অসামঞ্জস্য হলে বিনিময় সম্ভব হতো না। মুদ্রা প্রচলনের ফলে এ অসুবিধা দূর হয়েছে। বর্তমানে সরাসরি পণ্যের সাথে পণ্য বিনিময় না করে অর্থের সাথে পণ্যের বিনিময় করা হয়। পরবর্তীতে সেই অর্থ দিয়ে প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ক্রয় করে। এভাবে অর্থের মাধ্যমে বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। অতএব অর্থ বিনিময়ের সাধারণ মাধ্যম হিসেবে কাজ করে।

২. **মূল্যের পরিমাপক :** অর্থ মূল্যের পরিমাপক। বর্তমানে সকল প্রকার পণ্য-সামগ্রী ও সেবাকর্মের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অন্য দ্রব্য কী পরিমাণ পাওয়া যাবে তা অর্থের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। এভাবে অর্থ বিভিন্ন দ্রব্যসামগ্রীর মূল্য পরিমাপের সাধারণ মানদণ্ড হিসেবে কাজ করে থাকে।

৩. **সঞ্চয়ের ভান্ডার :** অর্থ সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে। মানুষ তার আয়ের পুরোটাই বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় না করে কিছু অংশ ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করে। অর্থের মূল্য অপেক্ষাকৃত স্থির বলে অর্থের মাধ্যমে সঞ্চয় করা নিরাপদ ও সুবিধাজনক। তাই মানুষ উদ্বৃত্ত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে তার মূল্য অর্থের মাধ্যমে ধরে রাখে। এভাবে অর্থ সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে থাকে।

খ. **সামাজিক কার্যাবলি :** অর্থ সামাজিক কাঠামো উন্নয়ন, সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি, সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণ ও ভবিষ্যৎ জীবনের নিশ্চয়তা বিধান করে থাকে। অর্থের প্রধান সামাজিক কার্যাবলি হলো–

১. **সামাজিক কাঠামো উন্নয়ন :** সামাজিক কাঠামো উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করতে অর্থ ব্যাপক ভূমিকা পালন করে। কেননা সামাজিক আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, সভ্যতা অর্জন ও তা লালন বা সংরক্ষণ করতে অর্থের প্রয়োজন হয়।

২. **ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা :** বর্তমানে অর্থ সঞ্চয় করে রাখলে ভবিষ্যতে মানুষের অনিশ্চিতজীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হয়।

৩. **সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি :** অর্থ সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সহায়তা করে। সমাজে অর্থ-বিত্তশালীকে সবাই সম্মান করে। বর্তমান যুগে যোগ্যতার চেয়ে বরং অর্থই মান-মর্যাদা নির্ণয়ের একক হিসেবে বিবেচিত হয়।

গ. **মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি :** অর্থ থাকলে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবন নিশ্চিত হয়, মান-মর্যাদা বাড়ে। এ কারণে অর্থশালী ব্যক্তির মনোবল বৃদ্ধি পায়। এ মনোবল মানুষকে প্রভাবশালী করে তুলে। অর্থ না থাকলে অর্থবহ যে-কোনো পরিকল্পনা অর্থহীন। সুতরাং মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে প্রধান ভূমিকা পালন করে অর্থ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান যুগে অর্থ উপর্যুক্ত নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে থাকে। যার ফলে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি ও সমৃদ্ধি লাভ করা সম্ভবপর হচ্ছে। তাই অর্থকে বর্তমান সভ্যতার সূচক হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

■ প্রশ্ন : ১৫ ॥ যাকাতের ব্যয়ের খাতসমূহ আলোচনা কর। [Discuss the Masaref of Zakat.]

উত্তর।। ভূমিকা : যাকাত ইসলামের স্তম্ভসমূহের মধ্যে অন্যতম। ঈমান ও নামাজের পরেই এর স্থান। পূর্বকালের প্রত্যেক নবীর উম্মতের উপরই সমানভাবে নামাজ ও যাকাত-এর বিধান কার্যকর ছিল। যাকাত মানুষকে লোভ থেকে মুক্ত রাখে, দান ও ব্যয় করতে অভ্যস্ত করে তোলে। যাকাত দ্বারা যাকাত দানকারী আল্লাহ তায়ালার চরিত্রে ভূষিত হয়।

➲ যাকাত বণ্টনের খাতসমূহ

যাকাতের খাত আয়াতে বর্ণিত ৮টিতেই সীমাবদ্ধ; যা হাদিসের মাধ্যমেও প্রমাণিত। নিম্নে এ আট শ্রেণির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো :

১. **ফকির বা দরিদ্র :** ফকির বলতে সেই ধরনের ব্যক্তিদেরকে বোঝায়, যারা একেবারে নিঃস্ব নয়। তাদের কিছু কিছু সহায় সম্পদ আছে। তবে এত কম যে, তা দিয়ে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ হয়। তাদের মৌলিক প্রয়োজন যথা– অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ও চিকিৎসার খরচ নির্বাহ করার মতো সংগতি নেই। অতি কষ্টে তারা দিন অতিবাহিত করে।

২. **মিসকিন বা নিঃস্ব :** যাদের জীবিকা নির্বাহের কোনো ব্যবস্থা বা নিশ্চয়তা নেই, দৈহিকভাবে অক্ষম, বাঁচার জন্য অন্যের কাছে হাত পাততে হয় তাদেরকে মিসকিন বা নিঃস্ব বলা হয়। অর্থাৎ যাদের মধ্যে অভাব, দীনতা এবং ভাগ্যাহত অবস্থা পাওয়া যায়, এমন সব লোকই মিসকীন। এদিক থেকে সাধারণ মুখাপেক্ষী লোকদের তুলনায় অধিকতর শোচনীয় অবস্থার লোকেরাই মিসকীন। এছাড়া অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্রস্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধী প্রভৃতি শ্রেণিও মিসকিনের অন্তর্ভুক্ত।

৩. **আমেলীন বা যাকাত আদায়কারী :** অর্থাৎ সেইসব লোক যারা যাকাত সংগ্রহ করা, সংগৃহীত সম্পদ হিফাজত করা, সেগুলোর হিসাব কিতাব সংরক্ষণ করা এবং তা ব্যয় বণ্টন করার কাজে সরকার নিযুক্ত কর্মচারী। এরা যেহেতু এই কাজে নিজেদের সময় ব্যয় করে, সেহেতু তাদের জীবিকা নির্বাহের দায়িত্ব ইসলামি সরকারের উপর বর্তায়।

৪. **মুয়াল্লাফাতুল কুলুব :** 'তালিফে ক্বলব' অর্থ হৃদয় জয় করা বা মন আকৃষ্ট করা। এটি কয়েকভাবে হতে পারে :

প্রথমত : যারা নও মুসলিম, সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছে, ধর্মান্তরের কারণে সে সমাজচ্যুত ও আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, এমনকি সম্পূর্ণ বঞ্চিত হতে পারে; এমতাবস্থায় তাকে সাহায্য দিয়ে, আর্থিকভাবে স্বয়ম্ভর করে তোলা ইসলামি রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

দ্বিতীয়ত : ইসলামের সাহায্য সহযোগিতার উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বিশেষ অথবা সংগঠনকে পরিতুষ্ট করার প্রয়োজন দেখা দিলে যাকাত তহবিল থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ এক্ষেত্রে ব্যয় করতে হবে।

তৃতীয়ত : কারও আত্মীয়স্বজনকে ইসলাম ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যও যাকাতের তহবিল থেকে তাদেরকে অর্থ দেয়া যেতে পারে। **চতুর্থত :** ইসলামের বিরোধিতাকারী কোনো ব্যক্তি অথবা সংগঠন শারীরিক, বুদ্ধিবৃত্তিক অথবা অন্য যে-কোনো উপায়ে ইসলামের বিরোধিতা অথবা ক্ষতিকারক কাজে লিপ্ত হলে তাকে প্রতিরোধ, প্রতিহত ও নিরস্ত্র করার কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় হবে।

৫. **ফীর রিকাব :** ফীর রিকাব অর্থাৎ, গলদেশ মুক্ত করার কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা। 'গলদেশ মুক্ত করার' অর্থ মানুষকে দাসত্বের জিঞ্জির থেকে মুক্ত করা। এর দুটি পথ রয়েছে। একটি পন্থা হলো, কোনো দাস যদি তার মনিবের সাথে চুক্তি সম্পাদন করে থাকে যে, আমি আপনাকে এই পরিমাণ অর্থ দান করলে আপনি আমাকে মুক্ত করে দেবেন, তবে তার মুক্তির মূল্য পরিশোধের জন্য তাকে সাহায্য করা। দ্বিতীয় পন্থা হলো, নিজেই যাকাতের অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে মুক্ত করে দেওয়া।

৬. **গারেমীন বা ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি :** ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি মানসিকভাবে সর্বদা বিপর্যস্ত থাকে এবং অনেক সময় জীবন সম্পর্কে হতাশ হয়ে পড়ে। তাদের জীবনী শক্তি লোপ পায়। অনেক সময় তারা অন্যায় ও অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং ইসলামি সমাজের দায়িত্ব হলো, যাকাতের অর্থ দিয়ে এরূপ প্রকৃত প্রয়োজনে ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিদের ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত করা।

৭. **ফী-সাবিলিল্লাহ বা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় :** পবিত্র কুরআনে 'ফী-সাবিলিল্লাহ' বা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় কথাটি বহুবার উল্লিখিত হয়েছে। এ কথাটির তাৎপর্য ব্যাপক। আল্লাহর রাস্তায় বলতে এমন সকল সৎ কাজই বুঝায়, যাতে আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট হন। এ কারণে কেউ কেউ মত প্রকাশ করেছেন যে, এ নির্দেশের আলোকে যাকাতের অর্থ সব ধরনের সৎকাজেই ব্যয় করা যেতে পারে; কিন্তু পূর্বতন ইমাম ও ফকীহদের অধিকাংশেরই মত হলো এখানে 'আল্লাহর রাস্তায়' অর্থ 'আল্লাহর পথে জিহাদ'। অর্থাৎ সেই চেষ্টা সংগ্রাম, যার উদ্দেশ্য কুফরী সমাজ ব্যবস্থাকে নির্মূল করে তদস্থলে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

৮. **ইবনুস-সাবিল :** ইবনুস-সাবিল এর অর্থ পথিক বা মুসাফির। অবশ্য যাকাতের ব্যয় খাতের ক্ষেত্রে এমন মুসাফির বা পথিককে বোঝানোই উদ্দেশ্য, যার কাছে সফরকালে প্রয়োজনীয় অর্থসম্পদ নেই, স্বদেশে তার যত অর্থসম্পদই থাক না কেন। এমন মুসাফিরকে যাকাতের অর্থ দেওয়া যেতে পারে, যাতে সে তার সফরের প্রয়োজনাদি সমাধা করতে পারে এবং স্বদেশে ফিরে যেতে সমর্থ হয়।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ইসলাম যে দৃষ্টিভঙ্গী প্রদান করেছে, তার সারমর্ম হচ্ছে, ধনসম্পদ একস্থানে পুঞ্জিভূত ও কুক্ষিগত হয়ে থাকতে পারবে না। ইসলামি সমাজের যে কয়জন লোক তাদের উচ্চতর যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের জন্য নিজেদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ধনসম্পদ আহরণ করবে, ইসলাম চায় তারা যেন এই সম্পদ পুঞ্জিভূত করে না রাখে; বরং এগুলো ব্যয় করে এবং এমন সব খাতে ব্যয় করে, যেখান থেকে ধন-সম্পদের আবর্তনের ফলে সমাজের স্বল্পবিত্ত লোকেরাও যথেষ্ট অংশ লাভ করতে পারে।

■ প্রশ্ন : ১৬ ॥ মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর। [Make distinction between profit and interest.]

উত্তর।। ভূমিকা : মুনাফা ও সুদের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। অনেকে আছেন যারা জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে সুদকে মুনাফার সাথে এক করে দেখার চেষ্টা করেন। সাধারণ মানুষ তো বটেই অনেক জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিও মুনাফা ও সুদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেন না। বিশেষ করে ব্যক্তিপর্যায়ে একজন সুদখোর এবং একজন ব্যবসায়ীর পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হলেও সনাতন সুদি ব্যাংকব্যবস্থা ও ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য করতে অনেক সময়ই ব্যর্থ হন। অর্থনীতিতে মুনাফা ও সুদের মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

➲ মুনাফা ও সুদের মধ্যকার পার্থক্য

মুনাফা ও সুদের পার্থক্য নিম্নে আলোচনা করা হলো :

পার্থক্যের বিষয়	মুনাফা	সুদ
১. আভিধানিক	মুনাফা বা লাভ এর শাব্দিক অর্থ কারবারে সাধিত প্রবৃদ্ধি। ক্রয় বিক্রয় ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের মাধ্যমে যে ধনসম্পদ অর্জিত হয় তাই মুনাফা।	সুদ বা রিবা -এর শাব্দিক অর্থ আধিক্য, বৃদ্ধি, বিকাশ, অতিরিক্ত সংযোজন, সম্প্রসারণ, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি।
২. ভিত্তি	মুনাফা বা লাভের সম্পর্ক ক্রয়বিক্রয়, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও বিনিয়োগের সাথে। মুনাফার ভিত্তি হলো প্রত্যক্ষভাবে দ্রব্য উৎপাদন ও বিক্রয় কিংবা লাভ-লোকসান অংশীদারি ভিত্তিতে অর্থ ও সম্পদ বিনিয়োগ করা।	সুদের ভিত্তি হলো ঋণ। ঋণ থেকেই সুদের উৎপত্তি।
৩. উৎপত্তি	দু'প্রকার পণ্যের লেনদেন, ক্রয়বিক্রয় এবং তা থেকে লাভ বা মুনাফা আসে। মুনাফা মূলত দ্রব্যসামগ্রী ও সেবার ক্রয়বিক্রয় অথবা ব্যবসায় স্বাভাবিক ফলস্বরূপ অর্জিত হয়।	একজাতীয় লেনদেনের সুদ হয়। সুদের বেলায় ক্রয়বিক্রয়, রূপান্তর সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

পার্থক্যের বিষয়	মুনাফা	সুদ
৪. নির্ধারক উপাদান	মুনাফা হওয়া না হওয়া কিংবা কম-বেশি হওয়া নির্ভর করে অনুকূল বাজার চাহিদার ওপর।	সুদের নির্ধারিত উপাদান তিনটি; সময়, সুদের হার ও মূলধনের পরিমাণ। কোনো মূলধনের সুদ ঋণের সময় বৃদ্ধির সাথে সাথে আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পায়।
৫. প্রক্রিয়া	মুনাফা পণ্য বা সেবা ক্রয়বিক্রয় প্রক্রিয়ায় মূলধনের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অংশ।	সুদ ঋণের বর্ধিত অংশ।
৬. শোষণ	মুনাফা শোষণ প্রতিরোধ করে।	সুদ শোষণের হাতিয়ার।
৭. অবক্ষয়	মুনাফা মানুষকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করে।	সুদ সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে। সুদের অভিশাপ মানুষকে বিভিন্ন অপকর্মে জড়িত হতে বাধ্য করে।
৮. উৎপাদন	মুনাফা উৎপাদন বৃদ্ধি করে। কেননা মুনাফার জন্য মানুষকে উৎপাদন করতে হয়।	সুদ উৎপাদনের বিরাট অন্তরায়। নিরাপদ ও ঝুঁকিহীন আয়ের আশায় মানুষ সুদে বিনিয়োগ করে।
৯. নিশ্চয়তা	মুনাফা অনিশ্চিত। কেননা বিক্রেতার লাভ হতেও পারে আবার লাভ নাও হতে পারে।	সুদে ঋণদাতার আয় নিশ্চিত। কিন্তু ঋণগ্রহীতার লাভের কোনো নিশ্চয়তা নেই।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, সুদভিত্তিক অর্থব্যবস্থা আল-কুরআন ও সুন্নাহর বিধি-বিধানের পরিপন্থি। সুদ বিলোপ করে লাভ-লোকসান অংশীদারিভিত্তিক ব্যবসায়-বাণিজ্য চালু করা হলে ব্যবসায়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে ঝুঁকি বণ্টিত হবে এবং ব্যবসায়ে আগ্রহ বহাল থাকবে। অপরদিকে মুনাফা হলো উৎপাদকের ঝুঁকি গ্রহণের পুরস্কার। একজন উৎপাদক উৎপাদিত দ্রব্য বিক্রয় করে যা আয় করে তা থেকে মোট ব্যয় বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকে তাই হলো মুনাফা। অর্থাৎ, মুনাফা হলো দ্রব্যের উদ্বৃত্ত মূল্য। মুনাফার উদ্দেশ্যেই উদ্যোক্তা তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

■ প্রশ্ন : ১৭ ॥ ইসলামি ব্যাংকের কাজসমূহ লেখ। [Write the mode of operations of an Islamic Bank.]

উত্তর।। ভূমিকা : ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক ইসলামি ব্যাংকব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইসলামি শরীয়তের নীতিমালার অনুসরণে এটি প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত। কুরআন ও হাদীসের আইনের অনুসরণে এর যাবতীয় কার্যক্রম ও লেনদেন নিয়ন্ত্রিত হয়। আল্লাহ তায়ালা ও তাঁর রাসূল (স)-এর অনুমোদিত কল্যাণধর্মী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এটি ইসলামি কেন্দ্রীয় ব্যাংককে সহযোগিতা প্রদান করে।

➲ ইসলামি ব্যাংকের কাজসমূহ

নিচে একটি ইসলামি ব্যাংকের কাজসমূহ আলোচনা করা হলো :

১. **আমানত গ্রহণ :** জনগণের কাছ থেকে অর্থ বা আমানত সংগ্রহ করা এবং এর লাভজনক বিনিয়োগের ব্যবস্থা করা ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সাধারণ কার্যাবলির অংশ। সুদমুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান হবার কারণে এর আমানত সংগ্রহ ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়া প্রচলিত ব্যাংকব্যবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নতর।

২. **সঞ্চয় সমাবেশকরণ :** ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হলো সঞ্চয় সমাবেশ করা। কেননা সামাজিক কল্যাণে সঞ্চয় সমাবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে জনগণের মধ্যে ব্যাপক ব্যাংকিং অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। জনগণকে সঞ্চয়ে উৎসাহ প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

৩. **ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ :** সুদভিত্তিক ব্যাংকব্যবস্থায় বিনিয়োগ বলতে অর্থলগ্নীকে বুঝায়। ব্যবহারিক দিক থেকে সুদভিত্তিক ব্যাংক এবং ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের মধ্যে বিনিয়োগ শব্দটির পার্থক্য অনেক। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ শেয়ার, সিকিউরিটি, ডিবেঞ্চার, বন্ড, ট্রেজারি বিল ইত্যাদিতে যে অর্থলগ্নী করে তাকে বিনিয়োগ বলা হয়; কিন্তু ইসলামি ব্যাংক উত্তম ঋণ (কর্জে হাসানা) ছাড়া অন্য সব ধরনের ব্যবসায়িক লেনদেনকে বিনিয়োগ নামে অভিহিত করে। প্রচলিত ব্যাংকসমূহ তাদের সব ধরনের অর্থলগ্নী সুদের ভিত্তিতে করে। কিন্তু ইসলামি ব্যাংক তার বিনিয়োগ কার্যক্রম লাভ-লোকসানে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করে। অন্যান্য ব্যাংক বিনিয়োগ কার্যক্রমে হালাল-হারামের পার্থক্য করে না; কিন্তু ইসলামি ব্যাংকের সকল বিনিয়োগ কার্যক্রম ইসলামি শরীয়ত মোতাবেক সম্পন্ন হয়, যা একটি শরীয়া বোর্ড তদারকি করে।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো বিশেষ গ্রুপ বা বিশেষ ব্যক্তির জন্য নয় বরং সমগ্র উম্মাহ (জাতি)-র জন্য কাজ করে। এ ব্যাংক ব্যক্তি মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হলেও এটি ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্পের সুযোগ-সুবিধা সমগ্র জাতির মধ্যে বণ্টন করে। ব্যক্তি বিশেষ বা গ্রুপ বিশেষকে একচেটিয়া সুযোগ সুবিধা প্রদান না করা ইসলামি বাণিজ্যিক ব্যাংকের বিনিয়োগ নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

■ প্রশ্ন : ১৮ ॥ মুশারাকা ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। [Explain the concept of 'Musharakah'.]

উত্তর।। ভূমিকা : মুশারাকা শব্দটি আরবি 'শিরকাত' থেকে এসেছে। 'শিরকাত' অর্থ শরিক হওয়া বা অংশীদার হওয়া। তাই শাব্দিক দিক থেকে মুশারাকার অর্থ অংশীদারিত্ব। অন্যকথায় বলতে গেলে, 'মুশারাকা' অর্থ হলো কোনো বিষয়ে পরস্পর একে অন্যের অংশীদার হওয়া।

➲ মুশারাকার সংজ্ঞা বা পরিচয়

'মুশারাকা' বলতে এমন একটি অংশীদারি কারবারকে বুঝায়, যেখানে দুই বা ততোধিক ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে লাভের উদ্দেশ্যে কারবার পরিচালনা করে এবং কারবারের লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে। কারবারে লাভ হলে অংশীদারগণ পূর্ব নির্ধারিত হারে তা ভাগ করে নেয় এবং লোকসান হলে নিজ নিজ পুঁজি অনুসারে তা বহন করে।

➲ প্রামাণ্য সংজ্ঞা

ইসলামি শরীয়ত ও ফকীহদের দৃষ্টিকোণ থেকে মুশারাকার সংজ্ঞা হলো নিম্নরূপ :

১. **হানাফি মাযহাব** মতে, মুশারাকা মানে দুই বা দুইয়ের অধিক ব্যক্তি যুক্তিযোগ্য কোনো একটি বস্তুর মধ্যে অংশীদার হওয়া।

২. **শাফেয়ী মাযহাব** মতে, দুই বা ততোধিক ব্যক্তির জন্য অনির্দিষ্টভাবে কোনো হক্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়াকে মুশারাকা বলে।

৩. **হাম্বলী মাযহাব** মতে, শিরকাত হলো কোনো অধিকার বা কর্তৃত্বের মধ্যে অংশীদারি হওয়া।

৪. **মালেকি মাযহাব** মতে, শিরকাত হচ্ছে দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মাঝে কোনো মূল্যবান বস্তুর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

৫. **Islamic Development Bank** -এর দেওয়া সংজ্ঞামতে মুশারাকা বলতে বুঝায়, "Musharaka is an Islamic financing technique that adopts 'equity sharing' as a means of financing projects. Thus, embraces different types of profit and loss sharing partnerships. the partners (entreprenuers, bankers etc.) share both capital and management of project so that profits will be distributed among them according to agreed ratio and loss is shared as per their equity participation (ratio)". অর্থাৎ, মুশারাকা হলো মূলধনে অংশীদারিত্ব বা ইকুইটি শেয়ারিং এর ভিত্তিতে কোনো প্রকল্পে বিনিয়োগের একটি ইসলামি অর্থায়ন পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে লাভ-লোকসানভিত্তিক বিভিন্ন অংশীদারি কারবার গড়ে ওঠে। এ প্রকল্পের লাভ বা ক্ষতি অংশীদারগণকে বহন করতে হয়। অংশীদারগণ (উদ্যোক্তা, ব্যাংক ইত্যাদি) প্রকল্পে মূলধন সরবরাহ করেন ও ব্যবস্থাপনায় অংশ নেন। তাদের মধ্যে চুক্তির শর্তানুযায়ী লাভের অংশ এবং মূলধন অনুপাতে লোকসান বণ্টন হয়।

৬. Central Shariah Board for Islamic Banks of Bangladesh প্রণীত ও বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরিত (প্রস্তাবিত) **'ইসলামি ব্যাংক কোম্পানি আইন'**-এ মুশারাকার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, "এমন এক ব্যবসায়িক চুক্তিকে মুশারাকা বুঝাবে, যার অধীনে কোনো কারবারে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে মূলধনের এক অংশ ব্যাংক কোম্পানি এবং অপর অংশ গ্রাহক যোগান দিবে। উক্ত ব্যবসায়ের মাধ্যমে অর্জিত মুনাফা চুক্তিতে উল্লিখিত অনুপাতে এবং লোকসান মুলধন অনুপাতে বণ্টিত হবে।"

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, মুশারাকা কারবারে অংশীদারগণের পুঁজি সমান বা অসমানও হতে পারে। আবার কেউ পুঁজি না দিয়েও মুশারাকা কারবারে অংশ নিতে পারে। মুশারাকা কারবারে মূল বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে অংশীদারদের প্রত্যেকেই কারবারের লাভ ও লোকসানে অংশগ্রহণ করছে।

■ প্রশ্ন : ১৯ ॥ ইসলামে শ্রমনীতির ব্যাখ্যা কর। [Explain the labour policy in Islam.]

উত্তর।। ভূমিকা : আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো শ্রম বিভাগ। বর্তমান যুগে সকল শিল্পপ্রতিষ্ঠানে কোনো না কোনোভাবে শ্রম বিভাগের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। তাই প্রথমেই আমাদের বুঝতে হবে শ্রমবিভাগ বা কর্মবিভাগ সম্পর্কে। ইসলামে শ্রম নীতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

➲ ইসলামে শ্রমনীতি

প্রচলিত অর্থনীতিতে শ্রমের সংজ্ঞা : সাধারণ অর্থে মানুষের সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমকেই শ্রম বলে। কিন্তু প্রচলিত অর্থনীতিতে সকল পরিশ্রমকেই শ্রম বলা হয় না। কেউ যদি নিজ আনন্দে খেলাধুলা করে পরিশ্রান্ত হয় এবং এর কোনো অর্থনৈতিক মূল্য না থাকে, তবে তাকে শ্রম বলা হয় না। বস্তুত মানুষের যে পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থ অর্জন করা যায়, তাকেই শ্রম বলে।

ইসলামি অর্থনীতিতে শ্রমের সংজ্ঞা : মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেবা ও উৎপাদনে নিয়োজিত সব ধরনের শারীরিক ও মানসিক শক্তিকে ইসলামি পরিভাষায় শ্রম বলে। এ অর্থে কোনো কোনো শ্রমের অর্থনৈতিক বিনিময় নাও থাকতে পারে। যেমন– রোগাক্রান্ত প্রতিবেশীর সেবা, দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর থাকা, আত্মীয়স্বজনদের খোঁজখবর নেওয়া, পরিবার-পরিজনের আদর যত্ন ও ভালোবাসার কাজ ইত্যাদি।

ইসলামি অর্থনীতিতে আখিরাতের জন্য মানুষের দুনিয়ার কার্যাবলিকে ব্যবসায় বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ মর্মে মহান আল্লাহ বলেন–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ۔ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে এমন একটি ব্যবসায়ের দিকে পথ দেখাব কি, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? আর সে ব্যবসায় হচ্ছে তোমরা আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ঈমান আনবে এবং তোমাদের জীবন ও সম্পদ দ্বারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করবে। (সূরা সফ : ১০)

সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, প্রচলিত অর্থনীতির ধারণা থেকে ইসলামি অর্থনীতিতে শ্রমের ধারণা ব্যাপক ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত। প্রচলিত অর্থনীতিতে উৎপাদনে নিয়োজিত পরিশ্রমকে শ্রম বলে গণ্য করা হয়। ইসলামি অর্থনীতিতে পরিশ্রমের মূল্য আছে বটে, তবে যে-কোনো কায়িক, মানসিক পরিশ্রম ও আত্মিক শ্রম যা সৃষ্টির জন্য কল্যাণকর কাজে ব্যয়িত, সবকিছুই শ্রমের অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, প্রচলিত অর্থনীতিতে শ্রম একটি বিক্রয়যোগ্য পণ্য। তবে যে নৈতিকতার প্রশ্নে সবধরনের কর্মকে শ্রম বলা যায়, সে নৈতিকতা-ই শ্রমকে বিক্রয়ের অযোগ্য বলে আখ্যা দেয়।

■ প্রশ্ন : ২০ ॥ ইসলামি বিমার গুরুত্ব বর্ণনা কর। [Describe the importance of Islamic Insurance.]

উত্তর।। ভূমিকা : বিমা ব্যবস্থাপনায় ইসলামি বিমার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। যে কারণে ইসলামি বিমা সমগ্রবিশ্বে প্রচলিত হয়েছে এবং বর্তমানেও তা অব্যাহত রয়েছে। বিশেষ সুবিধা থাকায় আধুনিক বিশ্বে ইসলামি বিমা নতুনভাবে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে।

➲ ইসলামি বিমার গুরুত্ব

নিচে ইসলামি বিমার গুরুত্ব আলোচনা করা হলো :

১. **ইবাদত কবুলের মাধ্যম :** ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য জীবিকা হালাল হওয়া শর্ত। যে হালাল জীবিকা গ্রহণ করে তার ইবাদত কবুল হয় আর যে হালাল জীবিকা গ্রহণ করে না তার ইবাদত কবুল হয় না। মহানবী (স) বলেন–

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ وَكُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنَ السُّحْتِ كَانَتِ النَّارُ أَوْلَى بِهِ.

অর্থাৎ, "যে গোশত হারাম থেকে গঠিত, তা বেহেশতে প্রবেশ করবে না। যে সকল গোশত হারাম মাল থেকে গঠিত তার দোযখই শ্রেষ্ঠ স্থান।" (আহমদ ও দারেমী বর্ণনা করেছেন এবং বায়হাকী ঈমান অংশে বর্ণনা করেছেন।)

হালাল জীবিকা উপার্জনে ইসলামি বিমা একটি সহায়ক মাধ্যম। এছাড়া সুদমুক্ত এবং ইসলামি শরীয়তের ভিত্তিতে পরিচালিত হওয়ায় এ বিমা হালাল উপার্জনের প্রেরণা। মোটকথা হালাল জীবিকার যোগানদাতা হিসেবে ইসলামি বিমা ইবাদত কবুলের মাধ্যমে পরিণত হয়েছে।

২. **অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি :** ইসলামি বিমার পদ্ধতি এমন যে, একবার কেউ বিমা চুক্তিতে আবদ্ধ হলে নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত পলিসিটি চালু রাখার জন্য প্রিমিয়াম পরিশোধ করে যেতে হয়। এ প্রিমিয়ামের অর্থ একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত উত্তোলন করা যায় না। কাজেই অনেকটা বাধ্যতামূলকভাবে অর্থ সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩. **নিরাপত্তা প্রদান :** পরিবার ও ব্যক্তির কোনো বিপদ আপদ, দুর্ঘটনা, মৃত্যু প্রভৃতি কারণে কোনো ক্ষতি হলে উক্ত বিষয়ের ওপর বিমা করা থাকলে বিমাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতিতে তার নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। ক্ষতি বা লোকসান যাতে না হয় সেজন্য বিমাপ্রতিষ্ঠান প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করে থাকে।

৪. **সচ্ছল জীবনযাপনের সুবিধা :** ইসলামি বিমা মানুষকে সঞ্চয়ী করে তোলে। সঞ্চয় মানুষের দুর্দিনের বন্ধু। তাই স্বাভাবিক অবস্থায় সচ্ছল মানুষ বিমার কল্যাণে যে-কোনো খারাপ সময়েও সচ্ছল জীবনযাপন করতে পারে। বিমার ক্ষতিপূরণের অর্থ অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ বিমা তার সচ্ছলতা নিশ্চিত করে থাকে।

৫. **জাতীয় সঞ্চয় বৃদ্ধি :** বিমার একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়। মেয়াদ পূর্ণ হওয়ার পূর্বে পলিসি ভেঙে সাধারণত অর্থ উত্তোলনের সুযোগ না থাকায় মানুষ বাধ্যতামূলকভাবে সঞ্চয় করে থাকে। ব্যক্তির বাধ্যতামূলক সঞ্চয় জাতীয় সঞ্চয়কে বৃদ্ধি করতে বিশেষ ভূমিকা রাখে। ফলে জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায়।

৬. **কর্মসংস্থান সৃষ্টি :** ইসলামি বিমা নতুন নতুন কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রথমত বিমা প্রতিষ্ঠান নিজেই কিছু কাজের ব্যবস্থা করে। বিমা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মী নিয়োগ দিয়ে থাকে। তারপর মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়া অথবা ক্ষতিপূরণ নেওয়া বিমার অর্থে ছোট ছোট অনেক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। বিমা প্রতিষ্ঠান উৎপাদন বৃদ্ধি ও মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে নিজেও কলকারখানা স্থাপন করে। ফলে অধিক লোকের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উপসংহার : উপরিউক্ত আলোচনা হতে বলা যায়, মানবজীবনে ইসলামি বিমার গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলামি বিমার মাধ্যমে ব্যক্তি সুদমুক্ত অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে, ব্যক্তিগত জীবনে আর্থিক নিরাপত্তা লাভ করে এবং ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

■ প্রশ্ন : ২১ ॥ যাকাতের গুরুত্ব আলোচনা কর। [Discuss the importance of Zakat.]

উত্তর।। ভূমিকা : যাকাত একটি ফরয ইবাদত। যাকাত অস্বীকারকারী কাফির হিসেবে গণ্য হয়। কোনো মুসলিম ব্যক্তি বা দল যাকাত অস্বীকার করলে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা যাবে। হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বলেছেন– وَاللّٰهِ لَوْ مَنَعُوْنِىْ عِقَالًا كَانُوْا يُؤَدُّوْنَهَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلٰى مَنْعِهٖ

অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় যাকাত হিসেবে আদায় করত বকরি বাঁধার এমন একগাছি দড়িও তারা যদি এখন আদায় করতে অস্বীকার করে, আল্লাহর শপথ, তাহলে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আমি যুদ্ধ করব। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

কুরআন মাজিদের অনেক জায়গায় আল্লাহ তায়ালা যাকাত আদায়ের অনিবার্যতা ঘোষণা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে– وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاٰتُوا الزَّكَاةَ অর্থাৎ, তোমরা সালাত কায়েম কর এবং যাকাত দাও (সূরা বাকারা : ৪৩ ও ১১০)।

➲ যাকাতের গুরুত্ব

১. **সম্পদ পবিত্রকরণ :** মানুষের সম্পদ পবিত্র করে যাকাত। কারণ ধনী ব্যক্তির সম্পদে যাকাত দরিদ্রের অধিকার। যতক্ষণ না এ অধিকার আদায় করা হয় ততক্ষণ সম্পদ অপবিত্র থাকে। এজন্যই মহানবী (স) বলেছেন– مَنْ اَدّٰى زَكٰوةَ مَالِهٖ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ شَرُّهٗ

অর্থ : যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত আদায় করে। সে তার সম্পদের দোষ দূর করে দেয়।

২. **সম্পদের মোহ ও লোভ নির্মূল :** সচ্ছল ও শান্তিপূর্ণ জীবন পরিচালনার জন্য অর্থ সম্পদের দরকার রয়েছে। অর্থের উপযোগিতার জন্যই এর প্রতি মানুষের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও লোভ থাকে। যাকাত অর্থের প্রতি মানুষের এ আকাঙ্ক্ষা ও লোভের কবর রচনা করে। বস্তুত বিনা লাভে নিঃস্বার্থভাবে একটা বিপুল অঙ্কের অর্থ যাকাত হিসেবে তাকে আদায় করতে হয়। ফলে তার অন্তর তীব্র মোহ ও লোভ থেকে বিরত থাকে।

৩. **আত্মশুদ্ধি :** যাকাত প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির আত্মা পবিত্র হয়। কেননা যাকাত আদায় করে সে তা প্রচার করতে পারে না। এজন্য গর্ব করতে পারে না। এমনকি যাকে যাকাতের অর্থ দিয়েছে, তার নিকট থেকে কোনো উপকারও আশা করতে পারে না। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বলেন– خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا

অর্থ : তাদের ধন-সম্পদ থেকে যাকাত গ্রহণ করুন। এতে তারা পবিত্র হবে এবং পরিশুদ্ধ হবে। (সূরা বাকারা : ১০৩)

৪. **তাকওয়া অর্জন :** ধন-সম্পদ মানুষের অত্যন্ত প্রিয় জিনিস। এর মাধ্যমে মানুষ সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও সামাজিক প্রতিপত্তির অধিকার লাভ করে। আল্লাহর প্রতি প্রেমের কারণেই ব্যক্তি এ সম্পদ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী বাহ্যিক কোনো লাভ ছাড়াই দান করে। কুরআন মাজিদে এসেছে– وَاٰتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهٖ

অর্থাৎ, আল্লাহর ভালোবাসার ভিত্তিতেই তারা ধনসম্পদ দান করে (সূরা বাকারা : ১৭৭)। অন্যত্র বলা হয়েছে, "আর তারা আল্লাহর ভালোবাসার ভিত্তিতেই নিঃস্ব, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার খাওয়ায়।" (সূরা বাকারা : ১৭৭)

বস্তুত যাকাত দিয়ে ব্যক্তি সম্পদের ভালোবাসার চেয়ে আল্লাহর প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসার প্রমাণ পেশ করে।

৫. **কৃপণতা থেকে মুক্তি :** যাকাত মানুষকে দানশীল ও উদার করে। নিঃস্বার্থ ও বিনা উপকারে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যক্তি নিয়মিত তার সম্পদের একটা বিশাল অংক যাকাত হিসেবে আদায় করে। ফলে সে কৃপণতার অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়। তার মধ্যে দানশীলতার অভ্যাস গড়ে ওঠে। পরিণতিতে সে হয়ে ওঠে সফল মানুষ।

উপসংহার : পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের পাঁচটি স্তম্ভের একটি হলো যাকাত। যাকাত দেওয়া মুমিনের বৈশিষ্ট্য। যাকাত দিয়ে মুমিন নিজের ঈমানি দৃঢ়তার প্রমাণ পেশ করে। মুশরিকরা যাকাত দিতে চায় না। সে জন্য শিরকের নিদর্শন হলো যাকাত না দেওয়া। তিনি বলেন– وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِيْنَ ۔ الَّذِيْنَ لَا يُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ كَافِرُوْنَ ۔

অর্থাৎ, মুশরিকদের জন্য ধ্বংস, যারা যাকাত আদায় করে না এবং তারাই আখিরাত অস্বীকারকারী। (সূরা ফুসসিলাত : ৬-৭)

■ প্রশ্ন : ২২ ॥ শ্রম বিভাগ কী? [What is division of Labour?]

উত্তর।। ভূমিকা : শ্রম বিভাগ আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থার একটি প্রধান দিক। বৃহদায়তন ও জটিল উৎপাদনের যুগে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিশেষায়নের মাধ্যমে অধিক উৎপাদন নিশ্চিত করাই শ্রম বিভাগের মূল লক্ষ্য।

➲ শ্রম বিভাগ

সাধারণ অর্থে কার্যের ভিন্নতার আলোকে সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে বিভিন্ন পর্যায়ে বিভক্ত করাকে শ্রম বিভাগ বলে। ব্যাপক অর্থে শ্রম বিভাগ হলো সমগ্র উৎপাদন পদ্ধতিকে সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা ও যোগ্যতানুযায়ী তাদের মধ্যে কর্মবণ্টন করার প্রক্রিয়া বিশেষ। যেমন, কোনো গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে কেউ নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী জামার কাপড় কাটে, কেউ কলার সেলাই করে, কেউ হাতা তৈরি করে, কেউ বোতামের ঘর মোড়াই করে, কেউ তৈরি জামা ইস্ত্রি করে, কেউ প্যাকিং করে প্রভৃতি। শ্রম বিভাগের ফলে প্রত্যেক শ্রমিকের কাজ অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত থাকে বলে অন্যান্য শিল্পের কাজের সাথে এর মিল ঘটে যায়। এতে বিভিন্ন শিল্পের মধ্যে শ্রমের গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। আবার শ্রম বিভাগের ফলে প্রত্যেক শ্রমিক তার পছন্দমত কাজ বেছে নিতে পারে। এতে কাজের আনন্দ ও স্বতোৎসারিত মনোভঙ্গি বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত পণ্যের উৎকর্ষতা বাড়ে। এছাড়া শ্রম বিভাগের ফলেই বর্তমান বিশ্বে বড় ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে।

উপসংহার : সুতরাং শ্রম বিভাগের ফলে শ্রমিকের দক্ষতা ও কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। যে শ্রমিক যে কাজে দক্ষ তাকে ঐ কাজে নিয়োগ করা যায়; কিন্তু শ্রম বিভাগ অনেক সময় কাজে একঘেঁয়েমি সৃষ্টি করে। একই কাজ বারবার করার ফলে ক্লান্তি ও বিরক্তি আসে। তবুও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতার সাথে সাথে শ্রম বিভাগের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।